সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা
অবতরণিকা -------------------- ২
প্রথম বাধাঃ ইখলাস না থাকা -------------------- ৪
দ্বিতীয় বাধাঃ আমল ত্যাগ -------------------- ১০
তৃতীয় বাধাঃ ওস্তায ছেড়ে কেবল কিতাবের উপর ভরসা ---------- ১৩
চতুর্থ বাধাঃ ছোটদের নিকট ইলম্ তলব করা -------------------- ১৫
পঞ্চম বাধাঃ শিক্ষায় পর্যায়ক্রমহীনতা -------------------- ২০
ষষ্ঠ বাধাঃ অহংকার ও গর্ববোধ -------------------- ৩১
সপ্তম বাধাঃ ফললাভে শীঘ্রতা -------------------- ৩৬
অষ্টম বাধাঃ হীনন্মন্যতা -------------------- ৪১
নবম ও দশম বাধাঃ দীর্ঘসূত্রতা ও সাধ -------------------- ৪৬
একাদশতম বাধাঃ ধৈর্যহীনতা -------------------- ৫০
ইল্ম তলবের পথে উলামাগণের উল্লেখযোগ্য সাধনা ও কষ্টস্বীকার -৫৪

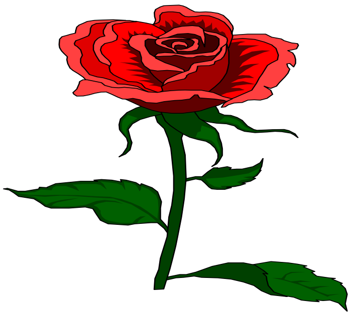

অবতরণিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الله وعلى آله وصـحبه أجمعين. وبعد:

বহু তালেবে ইল্‌ম আছে যারা বড় আলেম হওয়ার আশা রাখে কিন্তু কোন বাধা এসে তাকে সে পথে চলতে প্রতিহত করে। অনেকের নিকট যথেষ্ট ইল্‌ম তো থাকে কিন্তু তবুও কোন প্রতিবন্ধক থাকার কারণে নিজেকে যোগ্য আলেম বলে মনে করতে পারেন না অথবা লোকে তাঁকে বড় বলে মানে না অথবা নিজের প্রতিভার প্রতিভাত করতে পারেন না। যাঁরা বড় আলেম হতে চান তাঁরা নিশ্চয় সে সব বাধা ও প্রতিবন্ধককে জানতে ও চিনতে অবশ্য অবশ্যই আগ্রহী হবেন। অতঃপর পারলে নিশ্চয়ই তা উল্লংঘন করে প্রকৃত সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করে, আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজের মন ও জীবন থেকে ত্রুটির আগাছাসমূহ খুঁড়ে তুলে ফেলে উর্বর জমির মত উৎপাদনশীল করে ইল্‌মের পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করবেন।

ইল্‌মী জীবনে চলার পথে বহু ঘাত-প্রতিঘাতে, অসংখ্য বন্ধন ও বাধার সংঘাত ও সংঘর্ষে যারা প্রতিহত হয়েও চলতে চেয়েছে তাদের মধ্যে আমি একজন। তাই সে সব বাধার মূল উৎস সন্ধানে থেকে আমার মতই বহু সত্যানুসন্ধানীকে সে বিষয়ে অবহিত করার উদ্দেশ্যে কলম ধরেছি। ইতিপূর্বে দ্বীনী ইলম শিক্ষার নিয়ম ও নৈতিকতা সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা লিখে তালেবে

ইল্‌মের হাতে উপহার স্বরূপ তুলে দিয়েছি। অতঃপর শায়খ আব্দুস সালাম বিন বারজাস সাহেব কর্তৃক প্রণীত **(عوائق الطلب)** আমার নজরে পড়ে; যাতে তিনি ইল্‌মী পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকের কথা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু বইটি যেহেতু আরবের পরিবেশ সামনে রেখে লিখা হয়েছে সেহেতু আমি তার বিষয়বস্তুকে আমাদের পরিবেশে ঢেলে সাজিয়ে নিয়ে আমাদের দেশের তালেবে ইল্‌মকে সতর্ক ও অবহিত করতে প্রয়াস পেয়েছি। আমার সুনিশ্চিত আশা যে, তালেবে ইল্‌ম অবশ্যই এ পুস্তিকা দ্বারা উপকৃত হবে, নিরাশার অন্ধকারে আশার আলো পাবে এবং ফিরিয়ে আনবে নিজ হারানো শক্তি ও উদ্যমকে।

আল্লাহর নিকট আকুল আবেদন যে, তিনি যেন তাঁর বেহেশ্তের পথের পথিকদের হৃদয় দৃঢ় করেন, রাব্বানী আলেম হওয়ার তওফীক দান করেন এবং তাদেরকে তাঁর দ্বীনের খাস খাদেম বানিয়ে নেন। আমীন।

বিনীতঃ-

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী
আল-মাজমাআহ
সঊদী আরব,
রমযান1414 হিঃ

প্রথম বাধা

আল্লাহ্‌র তুষ্টি উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য

কোন উদ্দেশ্যে ইল্‌ম অন্বেষণ করা

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, 'যাবতীয় আমল নিয়ত (সংকল্প) এর উপরেই নির্ভশীল। প্রত্যেক মানুষের জন্য তাই লাভ হয় যার নিয়ত সে করে থাকে। অতএব যার হিজরতের (নিয়ত) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও রসূলের প্রতি হবে। আর যার হিজরত কোন পার্থিব সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে অথবা কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হবে তার হিজরত তারই জন্য হবে যার নিয়ত সে করেছে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'আহলে ইল্‌ম (উলামাগণ) যদি ইল্‌মের সুরক্ষা করত এবং তা প্রকৃত অধিকারীর নিকট স্থাপন করত তবে তার দ্বারা পৃথিবীর মানুষের নেতৃত্ব করতে পারত। কিন্তু তারা দুনিয়াদারের নিকট স্থাপন করেছে; যাতে তাদের দুনিয়া (পার্থিব সম্পদ) হতে কিছু পায়। যার ফলে দুনিয়াদারের নিকট তাঁদের আর কোন মূল্য নেই। আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি: "যে সমূদয় চিন্তারাশীকে একই চিন্তা করে নেয়, কেবলমাত্র পরলোকের চিন্তা। আল্লাহ তার ইহলোকের চিন্তার জন্য যথেষ্ট হন। আর যার চিন্তারাজী ইহলৌকিক বিষয়ে শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট হয়, সে যে কোনও উপত্যকায় ধ্বংস হয় আল্লাহর তাতে কোন পরোয়া নেই।" *(ইঃমাঃ ১/৯৫, হাকেম ২/৪৪৩)*

তালেবে ইল্‌ম (শিক্ষার্থী) যে সব বিষয়ে অধিক যত্নবান হয় তার মধ্যে সর্বাধিক যত্নযোগ্য রত্ন হচ্ছে তার নিয়ত (মনের সঙ্কল্প ও উদ্দেশ্য)। তার উচিত, ঐ নিয়তের সুচিকিৎসা করা, হেফাযত করা এবং তা যাতে 'গড়বড়' না হয়ে যায় তার সূক্ষ্ম খেয়াল রাখা। যেহেতু ইল্‌ম শিক্ষার ফযীলত ও মর্যাদা তখনই লাভ হয় যখন তা আল্লাহ তাআলার

সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে শিখা হয়। তার দেওয়া উজ্জ্বল দ্বীনকে সমুজ্জ্বল রাখার উদ্দেশ্যে অন্বেষণ করা হয়। নচেৎ তা যদি অন্য কারো সন্তুষ্টি লাভের আশায় হয়, পার্থিব সুখ অথবা সম্মান ও অর্থোপার্জনের আশায় হয় তবে নিশ্চয় তাতে কোনই ফযীলত নেই। বরং ঐ ইল্ম তার জন্য ফিতনা এবং বোঝ হবে যার পরিণাম হবে অতি ভয়ানক ও নিকৃষ্ট। জানা গেল যে, আমল গ্রহণযোগ্য তখনই হবে যখন আমলকারীর নিয়ত সঠিক থাকবে। আমল শুদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে তার হৃদয়ও পরিশুদ্ধ এবং উদ্দেশ্যও যথার্থ থাকবে। যেমন আল্লাহ পাক বলেন,

﴿وَمَا أُمِرُوْا إِلا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ﴾

অর্থাৎ, তারা আদিষ্ট হয়েছিল কেবলমাত্র আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর উপাসনা করতে।” *(কুঃ ৯৮/৫)*

অতএব শিক্ষার্থী যখন শিক্ষার পিছনে পার্থিব কোন কিছুর উদ্দেশ্য ও আশা রাখে তখন অবশ্যই সে প্রতিপালক আল্লাহর অবাধ্যতা করে, শুধুশুধু নিজের আত্মাকে কষ্ট দেয় এবং গোনাহর ভাগী হয়। অথচ দুনিয়ার সম্পদলাভ তার পক্ষে ততটাই সম্ভব হয় যতটা আল্লাহপাক তার নিয়তিতে নির্ধারিত করেছেন।

হযরত হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি নিজ পরলোক সুখময় করার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অনুসন্ধান করে সে পারলৌকিক সুখ লাভ করে। আর যে দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিক্ষা করে তবে সেটাই তার প্রাপ্য অংশ হয়। (পরলোক সে লাভ করতে পারে না)।’ *(দারেমী ১/৭০)*

এর চেয়ে বৃহত্তর কথা প্রিয় নবী ﷺ এর; তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি এমন শিক্ষা করে যার দ্বারায় সে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে, কিন্তু সেই শিক্ষা কেবল মাত্র পার্থিব কোন সম্পদলাভের আশায় শিখতে রত হয়, তবে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের গন্ধটুকুও পাবে না।” *(মুঃআঃ ২/৩৩৮, আঃদাঃ ৪/৭১)*

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিক্ষা করে তাদের সম্পর্কে হযরত আতা (রঃ) বলেন, যাদের গুণ এই (পার্থিব উদ্দেশ্যে ইলম শিখা) তাদের ইলমকে আল্লাহ পাক তাদের বিপক্ষে দলীল স্বরূপ এবং শাস্তিলাভের কারণ স্বরূপ করে রাখেন। অবশ্য তাদের দ্বারা কিছু উপকার দেখে ধোকা খাওয়া উচিত নয়। কারণ, হাদীসে বর্ণিত, “আল্লাহ তাআলা ফাজির (পাপী) ব্যক্তি দ্বারায়ও দ্বীনকে সাহায্য করেন।” যে ব্যক্তি পার্থিব সম্পদ ও সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করে তার উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে মুক্তার চামচার সাহায্যে বিষ্ঠা সংগ্রহ করে। মাধ্যম কি সুন্দর! কিন্তু যা সংগ্রহ করে তা কত নিকৃষ্ট! *(টীকা, মুসনাদে আবী য়্যা’লা ১১/২৬১)*

সহনূন বলেন, ‘ইবনে কাসেম প্রায় আমাদের কাছে এসে বলতেন, আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, এর (ইল্‌মের) স্বল্প ভাগ আল্লাহভীতিতে বহু অধিক। আর তার অধিক ভাগ আল্লাহভীরুতা ছাড়া অতি সামান্য। (যার কোন মূল্য নেই।) *(আস সিয়ার, যাহাবী ৯/ ১২২)*

ইউসুফ বিন হুসাইন বলেন, আমি যুন্নূন মিসরীকে বলতে শুনেছি, ‘ওলামাগণের তিনটি বিষয় দ্বারা আপোসে উপদেশ দেওয়া নেওয়া করতেন; এক অপরকে লিখতেন, যে নিজের অভ্যন্তর পরিষ্কার ও সুন্দর করে আল্লাহ তার বাহির সুন্দর করেন। যে আল্লাহ ও তার মাঝে সবকিছু শুদ্ধ করে আল্লাহ তার ও সকল মানুষের মাঝে সবকিছু শুদ্ধ ও সুন্দর করেন। যে পারলৌকিক বিষয়ে যত্নবান হয় আল্লাহ তার ইহলৌকিক বিষয়ে সুব্যবস্থা করে দেন।’ *(আস সিয়ার ১৯/ ১৪১)*

ইবনে মুবারক (রাঃ) বলেন, ‘ইলমের সর্বপ্রথম পর্যায় হল শুদ্ধ নিয়ত, অতঃপর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ, অতঃপর উপলব্ধি (বুঝা), অতঃপর হিফ্‌য (মুখস্থ বা স্মৃতিস্থ করা), অতঃপর আমল এবং তারপর প্রচার ও তবলীগ। *(জামেউ বায়ানিল ইল্‌ম অফাযলিহ ১/ ১১৮)*

এখানে একটি সতর্ক ও প্রনিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সলফের এক জামাআত বলেছেন, 'আমরা দুনিয়ার লোভে ইল্‌ম শিক্ষা করতাম কিন্তু তারপর ইল্‌ম আমাদেরকে আখেরাতের প্রতি আকর্ষণ করেছে। আমরা ইল্‌ম অন্বেষণ শুরু করেছি যখন কোন নিয়ত ছিল না। অতঃপর (আল্লাহর তুষ্টি বিধানের) নিয়ত এসেছে।' 'যে, গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে ইলম তলব করে ইল্‌ম তাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে না করে ছাড়ে না।' ইত্যাদি। *(জামিউ বায়ানিল ইলম ২/২২-২৩)*

এই কথাগুলির মূল্যবান ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইমাম যাহাবী (রঃ)। তিনি হযরত মা'মর বিন রাশেদের কথার ব্যাখ্যায় বলেন, 'বলা হত যে, মানুষ গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিক্ষা করে কিন্তু ইল্‌ম আল্লাহর উদ্দেশ্যে না করে ছাড়ে না।'

হ্যাঁ, প্রথমতঃ ইল্‌ম শিক্ষা শুরু করত কেবল মাত্র তার মহব্বতে (শিক্ষাকে ভালোবেসে) এবং মূর্খতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে, চাকুরী বা অন্য কিছু লাভের আশায়। তখন ইখলাস যে ওয়াজেব তা জানত না। নিয়ত কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানেরই হওয়া চাই তা ধারণায় ছিল না। কিন্তু পরক্ষণে যখন সে সবকিছু জানতে পারত তখন সাবধান ও সতর্ক হত, তার উদ্দেশ্যে ত্রুটির ভয়ঙ্কর পরিণাম বিষয়ে ভয়ার্ত হত এবং তার নেক নিয়ত ফিরে আসত -পুরোটাই অথবা কিছুটা। কখনোও বা কু-নিয়ত হতে তওবা করত এবং লজ্জিতও হত। আর তার লক্ষণ এই যে, সে অধিক ইলমের দাবী করে না। চ্যালেঞ্জ ও বিতর্কপ্রিয় হয় না। ইল্‌ম নিয়ে অহংকারী ও গর্বিত হয় না। বরং নিজেকে ছোট মনে করে। আবার যদি গর্ব করে বলে যে, 'আমি অমুকের চেয়ে বড় আলেম' তবে ইল্‌ম হতে সে বহু দূরে। *(আস্ সিয়ার ৭/১৭)*

যেমন কোন গল্পকার বলেন, এক ব্যক্তি একজন সম্ভ্রান্তা সুন্দরী যুবতীকে বিবাহের পায়গাম দিল। মেয়েটি তার দারিদ্র ও কুলমানহীনতা

দেখে বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করল। লোকটি চিন্তা করল, দুই-এর মধ্যে কোন্ জিনিস দিয়ে তাকে লাভ করা যায়? ধন-দৌলত দ্বারা অথবা মান সম্ভ্রম দ্বারা? পরিশেষে সে সম্ভ্রমের পথ বেছে নিল। ফলে তাকে লাভের উদ্দেশ্যে ইল্ম অন্বেষণ শুরু করল। কিছুদিন পর সত্য সত্যই সে এক উচ্চ পদস্থ বড় আলেম হয়ে উঠল। তা দেখে ঐ মহিলাটি নিজ হতে ঐ ব্যক্তির নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠাল। প্রত্যুত্তরে সে বলল, 'ইলমের উপর আমি কিছুকে প্রাধান্য দিবনা।'

যেহেতু ইল্ম শিখে সে নিয়ত পরিশুদ্ধ করতে শিখেছে। ইল্ম শিক্ষা ও অন্যান্য ইবাদতের সংকল্পে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়। ভয় করে সব কাজে তাঁকে। কারণ, "তাঁর বান্দাদের মধ্যে ওলামা সম্প্রদায়ই তাঁকে ভয় করে থাকে।" *(কুঃ ৩৫/২৮)*

সুতরাং সেই দিকে খেয়াল রেখে ঐ মহিলাকে আর বিবাহ করল না। যাতে তার ইল্ম শিক্ষা তাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে না হয় এবং তার নিয়ত হয় সত্য খাঁটি।

অতএব সাবধান ও হুশিয়ার হে তালেবে ইল্ম! যাতে নিয়তে শির্ক না হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহ পাক হাদীসে কুদসীতে বলেন, "আমি শির্ক হতে সমস্ত শরীকদের চেয়ে বেপরোয়া। যে কেউ এমন আমল করে যাতে সে আমার সহিত অপরকে শরীক (অংশী) করে, আমি তার শির্ক সহ তাকে প্রত্যাখ্যান করি।" *(মুসলিম)*

আরেফগণের নিকট সর্বসম্মত বিষয় যে, মানুষের ধ্বংস তখনই অবশ্যম্ভাবী হয় যখন আল্লাহ তাআলা তাকে তার আত্মার মাঝে বর্জন করে দেন; যখন শয়তান তাকে লুফে নেয় এবং তার চলার পথ বিভিন্ন হয়ে পড়ে। যার জন্য দোযখই হয় তার উপযুক্ত স্থান।

আহমদ বিন সালামাহ (রঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর (আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন) উদ্দেশ্যে হাদীস অনুসন্ধান করে আল্লাহ তাকে

প্রবঞ্চনায় ফেলেন।’

নিয়তের শুদ্ধতা ইলমের জন্য বড় সহযোগী প্রতিপন্ন হয়। যেমন, আবু আব্দুল্লাহর রওযবারী বলেন, ‘ইল্‌ম আমলের উপর নির্ভরশীল। আমল ইখলাস (শুদ্ধ নিয়তের উপর) নির্ভরশীল। আর ইখলাস আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান ও উপলব্ধি সঞ্চার করে।’ *(জামেউ বায়ানিল ইল্‌ম ১/১৯৯)*

ইব্রাহীম নখয়ী বলেন, ‘যে ব্যক্তি কিছু পরিমাণও ইল্‌ম অর্জন করে; যার দ্বারায় সে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাকে যথেষ্ট জ্ঞান দান করেন।’

অনেকে মনে করে যে, ইল্‌ম শিক্ষা করা জরুরী নয়; বরং আমলই ইল্‌মের জন্ম দেয় এবং কুরআনের এই আয়াতকে তার দলীল মনে করে। আল্লাহ বলেন, ﴿**واتقوا الله، ويعلمكم الله**﴾ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং তিনি তোমাদেরকে জ্ঞান দান করবেন। *(কুঃ ২/২৮২)*

তফসীরুল মানার *(৩/১২৮)* এ বলা হয়েছে, অনেক সূফীদের নিকট এই আয়াতের অর্থ প্রসিদ্ধ যে, তাকওয়া ও পরহেযগারী ইল্‌ম হওয়ার কারণ। আর এর উপরেই ভিত্তি করে তারা তাদের মনগড়া তরীকত, রিয়াযত, বির্দ ওযীফা পাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে ইল্‌ম অর্জন করার প্রচেষ্টা করে। ভাবে, কোন ইল্‌ম অন্বেষণ না করেই এই সবের মাধ্যমে কলবে কলবে ইল্‌ম উদ্ভাসিত হবে!

অথচ ওদের এইরূপ দলীল ধরা আদৌ সঠিক নয়। যেহেতু নহবী সিবওয়াইহ-এর মতে এইরূপ অর্থ করা বৈধ নয়। কারণ, **واتقـوا الله** (আল্লাহকে ভয় কর) এর উপর **ويعلمكـم الله** (তোমাদেরকে জ্ঞান দান করবেন) এর **عطف** (সংযোজন) পূর্বোক্তের **جزاء** বা **أمر** এর জওয়াব বা অনুক্রম হওয়াকে খন্ডন করে। যেহেতু আত্‌ফ ভিন্নতা চায়।

দ্বিতীয়তঃ ওদের এই উক্তিতে মুসাব্বাবকে সাবাব, ফারা’কে আস্‌ল

এবং নতীজাকে মুকাদ্দামা করা হয়। (অথচ এর বিপরীতটাই হওয়া বিধেয়)। কারণ বিদিত ও বোধগম্য যে, ইল্‌মই তাকওয়াহ ও পরহেযগারী সৃষ্টি করে। ইল্‌ম ছাড়া তাকওয়া হয় কি করে? ইল্‌মই হল তাকওয়ার মূল ও প্রধান কারণ। (কোন বিষয়ে কিছুর জ্ঞান না হলে তাকওয়া করবে কোথা হতে? বিনা ইল্‌মে তো বিদআত হওয়াই সম্ভব।)

ব্যাখ্যাতার এ কথাগুলি সত্যই মূল্যবান। অধিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলা যায় যে, আমল ও তাকওয়া হৃদয়ে অধিক ঈমানী শক্তি সঞ্চয় করে। যদ্দ্বারা মুত্তাকী অধিক ইল্‌মের অধিকারী হয় এবং অধিক ফল ও লাভ অর্জন করতে পারে; যা কোন অমুত্তাকী বা বেআমল ব্যক্তি লাভ করতে পারে না। আর একথা সকলের বিদিত ও প্রত্যক্ষ। কিন্তু যে বিনা ইল্‌মে আল্লাহর ইবাদত করে ও তাকওয়াগিরি দেখিয়ে ইল্‌ম বর্জন করে এবং বলে, **واتقوا الله ويعلمكم الله** সে জাহেল।

দ্বিতীয় বাধা

আমল ত্যাগ করা

আবু বারযাহ আসলামী প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “কিয়ামতের দিন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বান্দার পা সরবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, তার আয়ু কি কাজে ব্যয় করেছে, তার ইল্‌ম দ্বারা কি আমল করেছে, তার সম্পদ কোথা হতে অর্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে, তার দেহ কোথায় ধ্বংস করেছে -এসব সম্পর্কে। *(তিরমিযী, সহীহুল জামে’ ৭৩০০নং)*

অনুরূপভাবে খতীবও বর্ণনা করেছেন যে, তাকে তার ইল্‌ম ও তার মাধ্যমে সে কি আমল করেছে সে প্রসঙ্গে কৈফিয়ত করা হবে। *(ইকতিযাউল*

ইলমিল আমাল)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, ‘ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আলেম হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি মুতাআল্লিম (শিক্ষার্থী) হয়েছ। আর ইল্ম শিক্ষার পরও ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি কোন আলেম নও যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তার দ্বারায় আমল করেছ।’

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ‘ইল্ম আমলকে আহ্বান করে। যদি আলেম তাতে সাড়া দেয় তবে ইল্ম থাকে; নচেৎ প্রস্থান করে।’ (অর্থাৎ বেআমল আলেম, আলেম হয়না।)

ফুযাইল বিন ইয়ায বলেন, ‘আলেম নিজ ইল্ম দ্বারা আমল না করা পর্যন্ত জাহেলই থাকে। যখন আমল করে তখন সে আলেম হয়।’

আমলে ইল্ম সংরক্ষিত ও অধিক স্মৃতিস্থ থাকে। বেআমলে ইল্ম নষ্ট ও বিস্মৃত হয়। যার জন্য শা’বী (রঃ) বলেন, ‘আমরা হাদীস হিফ্য (মুখস্থ) করতে তার উপর আমলের সাহায্য নিতাম। আর হাদীস অন্বেষণ করতে অনশনের (রোযার) সাহায্য নিতাম।’ *(আলজামে’ ২/১১)*

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন, ‘আমি মনে করি জানা ইল্ম বান্দা কোন গোনাহর কারণে ভুলে যায়।’

সলফে সালেহীনগণের অভ্যাস ছিল ইল্ম দ্বারা আমল করা। যার দরুন তাঁরা এত অগ্রণী ছিলেন এবং তাঁদের ইলমে বর্কত ছিল। আর এই জন্যই আবু আব্দুর রহমান সুলামী (রঃ) বলেন, ‘আমাদেরকে আমাদের ওস্তাদগণ বর্ণনা করেছেন যে, যাঁরা নবী ﷺ এর ছাত্র ছিলেন তাঁরা দশটি আয়াত শিখলে ততক্ষণ পর্যন্ত আর আগে বাড়তেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ দশ আয়াতের বর্ণিত ও নির্দেশিত সমস্ত আমল করেছেন। তাই আমরা কুরআন ও আমল উভয়ই (একই সময়ে) শিক্ষা করেছি।’

ইল্ম দ্বারা আমল ত্যাগ করা দুই ধরনের হয়ে থাকে ঃ-

১- শরয়ী ফরয ও ওয়াজেব কর্ম বর্জন করা এবং শরয়ী হারাম ও অবৈধ কর্ম ত্যাগ না করা। জানার পর এটা কাবীরাহ গোনাহ (মহাপাপ)। আর এই আলেমদের সম্পর্কেই কুরআন ও হাদীসে আমল ত্যাগ করায় শাস্তি ভোগ করার কথা আলোচিত হয়েছে।

২- শরয়ী মুস্তাহাব (যা করলে পূণ্য হয় ও না করলে পাপ হয় না তা) ত্যাগ করা এবং মকরূহ (যা ত্যাগ করলে পূণ্য হয় ও করলে পাপ হয় না তা) পরিত্যাগ না করা। এটা নিন্দনীয় হলেও শাস্তির অঙ্গীকার ও ধমকমূলক আমল ত্যাগের হাদীসগুলি এমন আলেমকে শামিল করে না। তবে আলেম ও তালেবে ইলমের জন্য উচিত, যাবতীয় সুন্নতের উপর আমলে অভ্যাসী হওয়া এবং সকল প্রকার মকরূহ আমল হতে বেঁচে ও দূরে থাকা।

ইবনুল জওযী (রঃ) বলেন, 'নিহাতই মিসকিন তো সেই আলেম যার ইলমের বোঝা নিয়ে জীবন বিনষ্ট হল অথচ সেই অনুযায়ী কোন আমল করল না। (ইলমের পিছে সময় ব্যয় করে) পার্থিব সুখস্বাদও হারাল এবং পারলৌকিক কল্যাণও লাভ করতে পারল না। নিঃস্ব হয়ে পরলোক গমন করল এবং সেই ইল্‌ম হল তার বিপক্ষে শক্ত দলীল ও সবুত।' *(সাইদুল খাতির ১৪৪পৃঃ)*

সে আবার কেমন আলেম যে, আলেম অথচ নামাযে যত্নবান নয়, আলেম অথচ তার স্ত্রী-কন্যা বেপর্দা, আলেম অথচ অন্যায়ভাবে লোকের অর্থ ভক্ষণ করে, আলেম অথচ বলে গান-বাজনা হারাম নাকি?!! সুতরাং **إنا لله وإنا إليه راجعون.**

তৃতীয় বাধা

ওস্তাদ ছেড়ে কেবল কিতাবের উপর ভরসা করা

কতক তালেবে ইল্‌ম আছে যারা নিজের উপর এমন বিশ্বাস রাখে যে, তারা মনে করে, বিনা কোন আলেম বা ওস্তাদে কেবল মাত্র বই-পুস্তক পাঠ করেই আলেম হয়ে যাবে। কিন্তু এ ধারণা তাদের খাঁটি ভ্রান্ত। যেহেতু তাতে সে প্রকৃত ইল্‌মের নাগাল পাবে না। আসল শরয়ী জ্ঞানের তথ্য উদ্ধার করতে সক্ষম হবে না। তাদের ঐ জ্ঞানে থাকবে অগণিত ভ্রম, থাকবে পরস্পর-বিরোধিতা, আমলে থাকবে বিদ্‌আত এবং ফতোয়ায় থাকবে ভ্রষ্টতা।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি শুধুমাত্র কিতাবের উদর হতে জ্ঞান অন্বেষণ করবে (ও শরয়ী আলেম হতে চাইবে) সে সমস্ত আহকামকে ধ্বংস করে ফেলবে।’

তাঁদের কেউ কেউ বলতেন, ‘দ্বীনের জন্য বড় আপদ তারা যারা কিতাব-পত্রকে নিজেদের শায়খ বা ওস্তাদ বানিয়ে আলেম হয়।’ *(তাযকেরাতুস সা-মে’ অল মুতাকাল্লিম ৮-৭পৃঃ)*

ফকীহ সুলাইমান বিন মূসা বলেন, ‘বলা হত, কুরআনের নকল নবীশ (যারা লিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে তা)দের কাছে কুরআন শিখতে যেও না এবং ইলমের নকল নবীশদের নিকটও ইল্‌ম শিখতে যেও না।’ (যেহেতু তারা লিখতে জানলেও কি লিখছে তার সবটা বুঝে না। যেমন একজন হাফেয যদি আলেম বা ক্বারী না হয় তবে তার নিকট কুরআনের তর্জমা বা তফসীর অথবা ক্বিরাত শিখতে যাওয়া নিহাতই ভ্রষ্টতার কারণ।)

ইমাম সাঈদ বিন আব্দুল আযীয তনুখী (যিনি আওযায়ীর সমতুল্য আলেম ছিলেন তিনি)ও ঐ একই কথা বলেন।

যেমন পূর্বে বলা হত যে, ‘কিতাবই যার ওস্তাদ হয়, তার ঠিকের চেয়ে ভুলের ভাগই বেশী হয়।’

আবূ হাইয়ান নহবী বলেন, ‘অনেক অবুঝ লোকের ধারণা যে, কেবল মাত্র বই-পত্র পড়েই ইল্‌ম (জ্ঞান) অর্জন করা যায় এবং ইচ্ছা করলে সবকিছু বোঝা যায়। কিন্তু জাহেল জানে না যে, তার মধ্যে এমন বাক্য ও কথা থাকবে যা তার বোধগম্য নয় বা সহজে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাই যদি তুমি বিনা ওস্তাদে ইল্‌ম লাভ করার আশা রাখ তবে সঠিক পথ হতে অবশ্যই ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আর সমস্ত বিষয় তোমার মস্তিষ্কে তালগোল পাকিয়ে তুলবে এবং ধর্মের পথে অধিক ভ্রান্ত হবে তুমিই।’ (যেহেতু নিম হাকীমে জানের খতরা এবং নিম আলেমে ঈমানের খতরা থাকে। আর অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।)

কিন্তু তালেবে ইলমকে কেন ওলামাদের নিকট বসে তাদের মুখামুখি ইল্‌ম অর্জন করতে জরুরী বলা হয়েছে? জ্ঞানীরা এই কথার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ইবনে বাত্তাল বলেছেন, ‘কিতাবে এমন কতক ভ্রান্তকর (সন্দিগ্ধ) জিনিস থাকে যার কারণে মূল বক্তব্য স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না। কোন আলেম বা ওস্তাদের নিকট পড়লে তা ধরা পড়ে বা সে ভ্রান্তি হয় না। যেমন, মুদ্রাকর-প্রমাদ বা ছাপায় ভুল, দৃষ্টি প্রমাদে পড়ায় ভুল, এ’রাব (আরবীতে কোথায় জের, জবর বা পেশ হবে তার) ভুল, (এই ভুলে কর্তাকে কর্মকারক এবং মানুষকে পশু বানিয়ে দেওয়া হয় এবং এইমত আরো কতশত ভুল হয়ে থাকে এই এ’রাব না জানার কারণে।) বিরাম বা থামার স্থান না জানায় ভুল, (বিশেষ করে সেই সব কিতাবে যাতে যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়নি।) পুস্তকের পরিভাষা না জানায় ভুল, (নাসেখ-মানসূখ, সহীহ-যয়ীফ, আদেশ-উপদেশ প্রভৃতি না জানার প্রমাদ) ইত্যাদি।’ *(শারহু ইহয়্যায়ি উলুমিদ্দীন ১/৬৬)*

ডাক্তারের বিনা পরামর্শে কেবল বই পড়ে ওষুধ ব্যবহার করলে যেমন অনেক সময় বিপদে পড়তে হয় ঠিক তেমনিই কোন ওস্তাদ বিনা কেবল

বই পড়ে আলেম হতে চাইলে একই অবস্থা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

সুতরাং বাড়িতে বসে নিজে নিজে পড়ে কিছু শিক্ষার চেয়ে কোন আলেম ও ওস্তাদের নিকট বসে তা পড়া ও শিক্ষা করাই উচিত। অনুরূপ মুখস্ত করে ইল্ম হৃদয়ে স্থান না দিয়ে যদি কিতাবেই রেখে দেওয়া হয় তবে সে ইল্মেও তালেবে ইল্ম উপকৃত হতে পারে না। পুঁথিগত বিদ্যা সময়ে কাজে দেয় না।

‘গ্রন্থ-বিদ্যা আর পর হস্তে ধন,
নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন।’

প্রকাশ থাকে যে, ধর্মীয় বা পাঠ্য বিষয় ছাড়া কোন গায়বী খবর জানা, আরোগ্যলাভ, সন্তানলাভ, বর্কতলাভ, বিনা আমলে মুক্তিলাভ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে ওস্তাদ বা গুরু ধরা ঐ পর্যায়ে পড়েনা। নযর-নিয়ায পেশ করে ঐসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অথবা কিয়ামতে পারের জন্য কাউকে ওস্তাদ বা গুরু মনে করা শির্ক।

চতুর্থ বাধা

ছোটদের নিকট ইল্ম অর্জন

এ যুগে এক সমস্যা দেখা দিয়েছে যে, তালেবে ইলমদেরকে অনেক ক্ষেত্রে (স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়) বড়দের পরিহার করে ছোটদের নিকট ইলম শিক্ষা করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্যা শিক্ষার পথে এক বাধা, যথার্থ জ্ঞানান্বেষণের পথে একপ্রকার কাঁটা, তালেবে ইলমের এক মানসিক রোগ যার দ্বারা সে ইলম অর্জনে হীনমনা হয়ে যায়।

যেহেতু বড় ও অভিজ্ঞ আলেম থাকতে যাঁরা বয়সে ছোট; যাঁদের ইলমী অভিজ্ঞতা কম তাঁদের নিকট ইল্ম শিক্ষায় শিক্ষার্থী নিজেকে ধোকা দেয়। কারণ, তাতে প্রাথমিক শিক্ষার্থীর শিক্ষার বুনিয়াদ কাঁচা হয়ে

থাকে, ইলমী বিকলাঙ্গের নিকট থেকে সেও ঐরূপ বিকলাঙ্গ হয়ে যায়। বড় ও অভিজ্ঞ ওলামাগণের অভিজ্ঞতা ও দীর্ঘ ইলমীচর্চায় প্রাপ্ত আদর্শ ও চরিত্র হতে বঞ্চিত থেকে যায়।

হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) এর উক্তি এই কথার প্রতিই ইঙ্গিত বহন করে। তিনি বলেন, 'মানুষ ততকাল অবধি কল্যাণে থাকবে যতকাল তারা (তালেবে ইল্‌মরা) তাদের বড় ও বুযুর্গ আমানতদার (ও পরহেযগার বাআমল) ওলামাদের নিকট ইলম তলব করবে। যখনই তারা ছোট বেআমল ও অসৎ আলেমের নিকট ইলম শিক্ষা করবে তখনই তারা ধ্বংস হবে।'

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কিয়ামতের এক লক্ষণ এই যে, ছোটদের নিকট ইল্‌ম অনুসন্ধান করা হবে।"

এখানে 'ছোট' এর ব্যাখ্যা নিয়ে ওলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ ব্যাপারে) ইবনে আব্দুল বার্র (রঃ) *(জামে' ১/১৫৭ তে)* এবং শাত্বেবী (রঃ) *(ই'তিসাম ২/৯৩ তে)* অনেক উক্তির উল্লেখ করেছেন।

ইবনে কুতাইবা (রঃ) বলেন, 'ছোট বলতে যারা বয়োকনিষ্ঠ।' আর পূর্বোক্ত ইবনে মসঊদের উক্তির টীকায় বলেন, 'তাঁর বলার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ ততকাল অবধি কল্যাণে থাকবে যতকাল অবধি তাদের ওলামাগণ বয়োজ্যেষ্ঠ ও বুযুর্গ হবেন। আর বয়োকনিষ্ঠ ও কাঁচা যুবক হবেন না। কারণ, বুযুর্গ ও বৃদ্ধ তিনিই, যাঁর যৌনজ্বালা উপশমিত হয়ে গেছে, দীর্ঘ সময় ধরে বহু অভিমত ও পরিপক্কতা লাভ করেছেন। যাঁর ইলম ও জ্ঞানে কোন সন্দেহ ও সংশয় থাকবে না। যাঁর উপর তার প্রবৃত্তি বিজয়ী হতে পারবে না। যাঁকে কোন লালসা অবনমিত করতে পারবে না। সদ্য যুবকদের মত শয়তান যাঁর পদস্খলন ঘটাতে পারবে না। বয়সাধিক্যের সাথে যার গাম্ভীর্য, প্রতিভা, বিচক্ষণতা, সৌম্যতা ও মননশীলতা ইত্যাদি থাকবে।

কিন্তু তরুণ উদীয়মান আলেমদের মধ্যে হয়তো তা অনুপ্রবেশ করতে পারে যা বুযুর্গদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। অতএব যদি তুমি ঐ নব যুবকের নিকট জ্ঞান অন্বেষণ করতে যাও এবং সে ঐ কাঁচা অবস্থায় তোমাকে তা'লীম ও ফতোয়া দেয় তবে সে নিজে ধ্বংস হবে এবং তুমিও।' *(নসীহাতু আহলিল হাদীস, খতীব ১৬পৃঃ)*

ইবনে আব্দুল বার্র (রঃ) হযরত উমর (রাঃ) হতে একটি বর্ণনা নকল করেছেন, তিনি বলেন, 'কখন মানুষের শান্তি ও কল্যাণ হবে এবং কখন তাদের অশান্তি ও বিঘ্ন আসবে তা আমি অবশ্যই জানি; কোন বয়োকনিষ্ঠের নিকট হতে যখন ফতোয়া ও ফিক্হ আসবে বড় তখন তা অমান্য ও অগ্রাহ্য করবে। (তখনই তাদের মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে) এবং যখন কোন বড়র নিকট হতে ফিক্হ আসবে আর ছোট তার অনুসরণ ও মান্য করবে তখন দুজনেই সুপথপ্রাপ্ত হবে। (এবং শান্তি ও কল্যাণ বিরাজিত হবে।)'

হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন, 'তোমরা ততক্ষণ মঙ্গলে থাকবে যতক্ষণ তোমাদের ইল্ম থাকবে তোমাদের বড়দের কাছে। যখন ইল্ম তোমাদের ছোটদের কাছে থাকবে তখন বড় ছোটকে (না মেনে) বেঅকুফ ও অপক্ক ভাববে।'

অতএব এই দু'টি বর্ণনায় ছোটদের নিকট ইল্ম না শিখার কারণ যা ইবনে কুতাইবাহ দর্শিয়েছেন তা থেকে ভিন্ন ব্যক্ত করা হয়েছে। আর তা হল কোন ছোটর নিকট হতে ইল্ম বা ফতোয়া এলে তা অমান্য ও অগ্রাহ্য করার ভয়।

মোটকথা 'ছোট' শব্দটি সাধারণ যা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সকল প্রকার ছোটকেই বুঝায়।

তবে একথাটি যে সবার জন্য সর্বাবস্থায় সঠিক তা নয়। কারণ, ছোট সাহাবী ও তাবেয়ীগণের এক জামাআত তাঁদের বয়োজ্যেষ্ঠ থাকতে

তাঁদের সামনেই ফতোয়া ও দর্স্ দান করেছেন। তবে তাঁদের কথা অবশ্যই ভিন্ন। কারণ, তাঁরা ছোট হলেও তাঁদের মত প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব তাঁদের পরের যুগে সত্যই বিরল। পক্ষান্তরে যদি প্রায় সেই রকম কোন ছোট আলেম পাওয়া যায়, তাঁর পরিপক্কতা ও যোগ্যতা প্রসিদ্ধ হয়, তাঁর ইল্ম, দর্স ও তদরীসে প্রকৃত পরিপক্কতা ও সঠিক সফলতা প্রকাশ পায় এবং ঐরূপ কোন বুযুর্গ অভিজ্ঞ আলেম যদি না পাওয়া যায় আর যদি কোন বিঘ্ন না দেখা যায় তবে ঐ ছোটর নিকটই ইলম অর্জন করা প্রয়োজন।

আবার এই আলোচনার উদ্দেশ্য এই নয় যে, বড়রা থাকতে ছোটদের ইল্মের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হবে না বা ছোটদের নিকট শিখা যাবে না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সকলকে নিজ নিজ উপযুক্ত স্থান ও পদ দান করতে হবে। অতএব যারা ছোট হবেন প্রাথমিক শিক্ষা তাঁদের নিকট শিখতে হবে। বা যতটা শিক্ষাদান তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে ততটা শিখা হবে; তার বেশী নয়। তাছাড়া তাঁর নিকট হতে ফতোয়া চাওয়া, কোন সমস্যার সমাধান চাওয়া ইত্যাদি উচিত নয়। কারণ, এটা তাঁর জন্য ও সকলের জন্য ধ্বংসের হেতু।

অতএব তালেবে ইল্মের উচিত বুযুর্গ ও অভিজ্ঞ আলেমের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করা, যাঁর বিগত আয়ু ইল্মেই ব্যয় হয়েছে। ইল্মী মসনদে যাঁর বার্ধক্য এসেছে। তাঁকে হারিয়ে ফেলার পূর্বে তাঁর শিষ্যত্ব ও সাহচর্য গ্রহণ করা। তাঁর ইল্মী গুপ্তখনির দ্বার উদ্ঘাটন করা কর্তব্য।

দুঃখের বিষয় যে, এ যুগের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ প্রকৃত ওলামাদের মূল্যায়ন করতে এবং সঠিক যোগ্য আলেম চিহ্নিত করতে খুবই ভুল করে থাকে। তাই যদি কারো নিকট কোন জালসা মহফিলে বা মসজিদে সাহিত্য বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা অথবা মর্মস্পর্শী ওয়ায শোনে অথবা কাউকে লম্বা আলখাল্লা বা জুব্বা পরা ও পাগড়ী বাঁধা দেখে তবে

তাকেই প্রকৃত আলেম বলে ধারণা করে বসে এবং তাকে নানা ফতোয়া ও সমস্যার কথা জানিয়ে উত্তরের আশা করে।

অথচ এটা এক বেদনাদায়ক বিপদ এবং ভয়ানক মসীবত যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি হতে চলেছে। অর্থাৎ অযোগ্য আলেমের উপর ইল্মী ভরসা বেড়ে চলেছে। আর যখন অযোগ্য লোকের উপর কোন যোগ্য কাজ সমর্পণ করা হবে তখনই কিয়ামতের অপেক্ষার সময়।

অতএব তালেবে ইল্ম (প্রতি মুসলিম) এর উচিত ওঁদের নিকট হতে কোন ধর্মীয় সমাধান বা ইল্ম না নেওয়া। ইল্ম নেবে তাঁদের নিকট যাঁরা ইল্মে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। কেউ ভালো বক্তৃতা বা ওয়ায করতে পারলেই আলেম হয়ে যায় না। দেখতে আবেদ হলে, লোকে তার খিদমত করলে, তার অসংখ্য ভক্তদল হলে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির তালে তাল মিলিয়ে কথা বললে বা তর্কশাস্ত্রে পারদর্শী হলেই দ্বীনী আলেম হয়ে যায় না। প্রকৃত আলেম চেনার কষ্ঠিপাথর আছে ভিন্ন।

পূর্বালোচনার অর্থ এই নয় যে, তাঁদের বক্তৃতা শোনা হবে না বা তাঁদের নিকট পড়া হবে না যেমন অনেকে মনে করতে পারে। বরং তার অর্থ এই যে, কোন জটিল বিষয়ে ফতোয়া বা ইলম তাঁদের নিকট গ্রহণ করা যাবে না এবং তাঁদেরকে ঐ রব্বানী ওলামাগণের আসনে বসানো যাবে না।

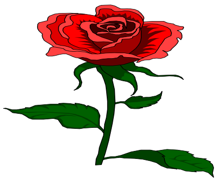

পঞ্চম বাধা

শিক্ষায় পর্যায়ক্রমহীনতা

ইলম শিক্ষায় ক্রমবর্ধমানতা ও ক্রমানুয় জরুরী হওয়ার প্রসঙ্গে ওলামাগণ সকলেই একমত। যেহেতু ধীরে ধীরে স্বল্পাকারে অর্জন করা এবং এইভাবে কিছু সময় ধরে ইল্‌মে উদ্দিষ্ট বিষয় পূর্ণ করা ইল্‌ম শিক্ষার এক সুন্দরতম যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি।

এ পদ্ধতিটি কালাম মাজীদ হতে গৃহীত হয়েছে। আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল্‌ বলেন,

﴿وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً﴾

অর্থাৎ, আমি খন্ড-খন্ডভাবে কুরআন অবতীর্ণ করেছি; যাতে তুমি তা মানুষের নিকট ক্রমে ক্রমে পাঠ করতে পার। আর আমি তা যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। *(কুঃ ১৭/১০৬)*

তিনি আরো বলেন, “কাফেররা বলে, ‘সমগ্র কুরআন তার নিকট একেবারে অবতীর্ণ হল না কেন?’ এ আমি তোমার নিকট এভাবেই অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি তোমার হৃদয়কে শক্ত ও দৃঢ় করার জন্য।” *(কুঃ ২৫/৩২)*

যুবাইদী বলেন যে, ‘(একটির পর একটি বিষয়ে জ্ঞানচর্চা কর্তব্য।) বর্তমান বিষয়ে দক্ষতা লাভ না করা এবং তা হতে প্রয়োজন না মিটার পূর্বে পরবর্তী দ্বিতীয় কোন বিষয়ে জ্ঞানচর্চায় ধ্যান না দেওয়াই উচিত। কারণ একই কর্ণকুহরে (একই সময়) বিভিন্ন বিষয়ের ইলমের ভিড় মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিমত্তাকে ভ্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত করে ফেলে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইঙ্গিত করেন, “যাদেরকে কিতাব দান করেছি তারা যথাযথভাবে তা পাঠ করে----।” *(কুঃ ২/১২১)*

অর্থাৎ, তারা কিতাবের কোন বিষয় অতিক্রম করে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তা সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে শিক্ষা করে এবং সেইমত যথাযথরূপে আমল

করে। (এবং এটাই হচ্ছে তেলায়তের হক বা যথার্থরূপে তেলায়ত করা।) কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমরা কুরআনী চিনি বহন করি অথচ তার মিষ্টতা বুঝি না। সূরলহরীতেই তন্ময় হই। কিন্তু তা উপলব্ধি ও আমল করাতে যত্নবান নই। **فالله المستعان**

অতএব শিক্ষার্থীর উচিত, প্রথম তাই দিয়ে শুরু করা যা তার জন্য একান্ত জরুরী। আর ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হওয়া যা অপেক্ষাকৃত কম জরুরী। তবে খেয়াল রাখতে হবে, যাতে এই জরুরী পর্যায় নিরূপণে কোন প্রকার ত্রুটি না ঘটে।

এই সূত্র ও নিয়ম-মাফিক না চলার কারণে বহু শিক্ষার্থী (চেষ্টা সত্ত্বেও) গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারেনি। যেখানে তার উচিত ছিল, এক বিষয়ে যোগ্যতা লাভ করার পর অন্য বিষয়ের প্রতি ধাপে ধাপে আগে বাড়া। আর এইরূপে এক সমাপ্তিতে পৌঁছে যাওয়া। *(শারহুল ইহয়্যা’ ১/৩৩৪)*

এই ক্রমোন্নতি দুটি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কতকগুলি বিষয়ের মাঝে ক্রমোন্নয়ন অথবা কেবল মাত্র একটি বিষয়ের মাঝেই ক্রমোন্নয়ন। এই দুই ক্ষেত্রেই দুই ইলমী ক্রমবর্ধমানতা শিক্ষক ও কালপাত্র অনুসারে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এখানে আমরা পাঠকের জন্য ওলামাগণের কয়েকটি নির্দেশ পেশ করব। যেটা তালেবের জন্য সহজ ও সুবিধা হবে ওস্তাদের সম্মতিক্রমে সেই নির্দেশে নিজের পাঠ্যজীবন এবং ইল্মী সফর শুরু করবেন।

ইবনে জুরাইয বলেন, আমি আতার কাছে এলাম। আমার ইচ্ছা ইল্ম শিখব। দেখি তাঁর নিকট আব্দুল্লাহ বিন উবাইদ বিন উমাইর রয়েছেন। আমার প্রতি লক্ষ্য করে ইবনে উমাইর বললেন, ‘তুমি কুরআন পড়েছ?’ আমি বললাম, ‘না।’ তিনি বললেন, ‘তবে যাও, কুরআন পড়। অতঃপর (অন্যান্য) ইলম অন্বেষণ কর।’ আমি সেখান হতে চলে গিয়ে কিছুদিন ধরে কুরআন পড়লাম। অতঃপর আতার নিকট আবার

এলাম। দেখি তাঁর নিকট আব্দুল্লাহ (ইবনে উমাইর) রয়েছেন। তিনি আমার উদ্দেশ্যে বললেন, ‘ফারায়েয পড়েছ?’ আমি বললাম, ‘না।’ তিনি বললেন, ‘ফারায়েয শিখে ইলম তলব কর।’ অতঃপর আমি ফারায়েয শিক্ষা করলাম তারপর তাঁর নিকট এলাম। তিনি বললেন, ‘এবারে তুমি ইল্‌ম শিখ।’ *(আস্‌সিয়ার ৬/৩২৭)*

আবুল আইনা বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন দাঊদের নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন, ‘কি উদ্দেশ্যে আসা হল?’ আমি বললাম, ‘(হাদীস) শিখব।’ তিনি বললেন, ‘যাও আগে কুরআন হিফ্‌য কর।’ আমি বললাম, ‘কুরআন হিফ্‌য করেছি।’ তিনি বললেন, ‘পড়, **وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوْحٍ..** আমি এক দশমাংশ পড়ে শেষ করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, ‘এখন যাও ফারায়েয শিখে এস।’ আমি বললাম, ‘সুল্‌ব (ঔরষজাত সন্তান) জাদ্দ্‌ (পিতামহ, মাতামহ প্রভৃতি) এবং কুব্‌র (নিকটাত্মীয়)এর আহকাম শিখেছি।’ তিনি প্রশ্ন করলেন, ‘তবে তোমার ভাইপো ও তোমার চাচার মধ্যে কে তোমার অধিক নিকটবর্তী?’ আমি বললাম, ‘ভাইপো।’ তিনি বললেন, ‘তা কেন?’ আমি বললাম, ‘কারণ, আমার ভাই আমার মা হতে এবং চাচা আমার দাদা হতে। (আর দাদা হতে মা নিকটের।)’ বললেন, ‘যাও এখন আরবী ভাষা শিখ।’ বললাম, ‘আরবী তো ঐদুয়ের পূর্বেই শিখেছি।’ তিনি প্রশ্ন করলেন, ‘হযরত উমর (রাঃ) কে যখন ছুরিকাঘাত করা হল তখন ‘ইয়া লাল্লাহি অলিল মুসলিমীন!’ কেন প্রথমটায় লামে যবর এবং দ্বিতীয়টায় যের দিয়ে বলেছিলেন?’ বললাম, ‘প্রথম লামটায় যবর দিয়েছেন; কারণ তা দুআ। আর দ্বিতীয়টায় যের দিয়েছেন কারণ তা ইস্তিগাসা এবং ইস্তিনসার।’

অতঃপর তিনি বললেন, ‘যদি কাউকে হাদীস বর্ণনা করি তো তোমাকে অবশ্যই করব।’ *(আস্‌সিয়ার ৯/৩৫১)*

ইবনে আব্দুল বার্র বলেন, ‘ইল্ম তলবের ধাপ, পর্যায় ও অনুক্রম আছে যা উল্লংঘন ও অতিক্রম করা উচিত নয়। যে একেবারে উল্লঙ্ঘন করে আগে বাড়তে চায় সে সলফে সালেহীনদের পথ অতিক্রম করে চলে। আর যে ইচ্ছাকৃত তাঁদের পথ অতিক্রম করে সে পথভ্রষ্ট হয় এবং সে অনিচ্ছায় উত্তম ভেবে তা করে তার পদস্খলন ঘটে।’ *(আল জামে’ ২/১৬৬)*

ইউনুস বিন ইয়াযিদকে উদ্দেশ্য করে যুহরী বলেছেন, ‘ইলমের ব্যাপারে অবিমৃশ্যকারী হয়োনা। কারণ, ইল্ম বহু উপত্যকার মত। যেখান দিয়ে চলতে শুরু করবে সমাপ্তির পূর্বেই তুমি নিজে হারিয়ে যাবে। তবে দিবা-রাত্রে কিছু কিছু করে গ্রহণ কর। একই সাথে সর্বপ্রকার ইল্ম শিক্ষা করার অপচেষ্টা করো না। কারণ যে একই সাথে সর্বপ্রকার ইলম সঞ্চয় করার ইচ্ছা করে তার সবটাই বিস্মৃত হয়ে যায়। তাই একটার পর একটা বিষয়ে দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা কর।’ *(ঐ ১/১০৪)*

অতএব প্রথম ইলম, আল্লাহর কালাম কুরআন কারীম হিফ্য করা তা বুঝা এবং তা বুঝতে যে ইল্ম সাহায্য করে (যেমন আরবী ভাষা, নহু, সর্ফ, তফসীর ইত্যাদি) তা শিক্ষা করা ওয়াজেব।

অবশ্য বলছি না যে, পুরো কুরআনই হিফ্য করা সকলের জন্য জরুরী। কিন্তু বলছি যে, যে ব্যক্তি (আলেমের মত) আলেম হতে চায় তার জন্য হিফ্য করা নিশ্চয় ওয়াজেব। তবে আল্লাহর তরফ হতে ফরয নয়।

সুতরাং যে কেউ সাবালক হওয়ার পূর্বেই কুরআন হিফ্য করে নেবে এবং তার পর তা বুঝার জন্য অন্যান্য জরুরী ইল্মের প্রতি অগ্রসর হবে তার জন্য পরবর্তী ধাপে কুরআনী উদ্দেশ্য এবং হাদীসের মর্মার্থ বুঝতে বড় সহায়তা ও সহযোগিতা লাভ হবে।

অতঃপর কুরআনের নাসেখ-মনসূখ (কোন আয়াত রহিত ইত্যাদি), তার আহকাম (আদেশ ও নিষেধ) এর বিষয়ে জ্ঞানার্জন করবে। কোনও

বিষয়ে ওলামাগণের মতানৈক্য বা ঐক্য থাকলে তা ভালোরূপে জানবে। আর এরূপ যার জন্য আল্লাহ সহজ করেন তার জন্য খুবই সহজ।

অতঃপর সহীহ ও (শুদ্ধ এবং হাসান) হাদীস অধ্যয়ন করবে। যার দ্বারায় কুরআনের ব্যাখ্যা ও মর্মার্থ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে। বিশেষ করে হাদীস শরীফে বহু স্থানে কুরআনী অনেক বিষয় মনসূখ (রহিত) হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে তা জানা যাবে।

যে হাদীস পড়তে চাইবে তার উচিত, প্রসিদ্ধ ইমামগণের (যেমন বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি) হাদীস গ্রন্থের উপর নির্ভর করা। সুতরাং সবকিছুর আগে তালেবে ইল্‌ম হাদীস শাস্ত্রে মনোযোগ দেবে, কুরআনী আহকাম আয়ত্ত করবে এবং ফকীহ ও ইমামগণের উক্তিসমূহ জেনে তা নিজের ইজতেহাদের সহযোগী করবে এবং গবেষণা ও আলোচনা-দ্বারের চাবি করবে, যে হাদীসের একাধিক অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সে হাদীসের যথার্থ ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করবে। ইমামগণের কারো এমন তকলীদ করবে না যেমন সুন্নাহ (হাদীস)এর করা হয়; যার অনুসরণ ও তকলীদ করা বিনা দ্বিধা ও ভাবা-চিন্তায় সর্বাবস্থায় জরুরী। বিগত উলামাগণের মত সুনান (হাদীস) স্মৃতিস্থ রেখে তার উপর বিভিন্ন গবেষণা করবে। ঐ চিন্তা-গবেষণায় ও কোন সমস্যার সমাধানের খোঁজে তাঁদের অনুসরণ করবে। ঐ দ্বার উদ্‌ঘাটনের জন্য, তাঁদের দ্বীনী খিদমতের শত প্রচেষ্টার জন্য এবং তাঁদের দ্বারা নিজে উপকৃত হওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। তাঁদের সঠিক নির্দেশ ও সমাধানের উপর -যা তাঁদের উক্তির অধিকাংশেই বিদ্যমান- প্রশংসা করবে। অবশ্য তাঁদের পদস্খলন বা ভুল-ত্রুটি যে হয়নি তা মনে করবে না। যেমন সে নিজেকেও এ ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত ধারণা করবে না।

এই শিক্ষার্থীই প্রকৃতপক্ষে সলফের অনুগামী হবে। আর সে-ই ইলমের যথেষ্ট অংশ লাভ করবে, সুপথ ও সুমতের অধিকারী হবে। প্রিয়

নবী ﷺ এর নির্দেশ ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের অনুবর্তী হবে।

ইবনুল জওযী বলেন, ‘সকলের জানা আছে যে, সকলের বয়স স্বল্প এবং ইল্‌ম কত বেশী। তাই শিক্ষার্থীর উচিত, প্রথমতঃ কুরআন পড়া ও হিফ্‌য করা দিয়ে ইল্‌ম আরম্ভ করা। তফসীরের প্রতি এমন মধ্যম দৃষ্টি দেওয়া যাতে কোন বিষয় অস্পষ্ট থেকে না যায়। ঐ সাথে সাবআ ক্বিরাআত এবং আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণের বই পড়াও সঠিক।

অতঃপর হাদীসের মূল গ্রন্থগুলি পড়তে শুরু করবে, যেমন সিহাহ (বুখারী, মুসলিম) মাসানীদ (মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আবী য়্যা’লা) সুনান (আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ) ইত্যাদি। আর সাথে সাথে ইল্‌মে মুস্তালাহুল হাদীস বা ওসূলে হাদীস (যার দ্বারা হাদীসকে যয়ীফ ও জাল হতে পৃথক করা সম্ভব হয় তা) পড়বে। যয়ীফ ও তদপেক্ষা নিম্নমানের বর্ণনাকারীদেরকে চিহ্নিত করার জন্য রেজালশাস্ত্র পড়বে; যা ওলামাগণ এমনভাবে সুসজ্জিত ও গচ্ছিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন যাতে শিক্ষার্থীকে এমন কোন বেশী কষ্ট স্বীকার করতে হবে না।

তারীখ বা ইসলামী ইতিহাস ততটুকু পড়বে যতটুকু জানা একান্ত দরকার। যেমন প্রিয় নবী ﷺ এর বংশ, আত্মীয়-স্বজন ও পত্নীগণের অবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু জানবে। অতঃপর ইল্‌মে ফিক্‌হ এর প্রতি অগ্রসর হবে। মযহাব ও মতানৈক্যের বিষয়ে গবেষণা করবে। যে সব সমস্যায় মতভেদ আছে সে সবেই অধিক ধ্যান দেবে। সমস্যাটিতে কেন এত মতভেদ দেখা দিল তার কারণ খোঁজার চেষ্টা করবে এবং তার মূল উৎস থেকে প্রকৃত সমাধান জানার প্রচেষ্টা চালাবে। যেমন আয়াতের তফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা এবং শব্দার্থ জানার জন্য বিশেষ অভিধান ব্যবহার করবে।

ওসুলে ফিক্‌হ (সমস্যার সমাধানে সঠিক জ্ঞানলাভের নিয়মনীতি)

এবং ফারায়েয পড়বে। আর মনে রাখবে যে, সমস্ত ইলমের নির্ভরস্থল হচ্ছে ফিক্হ।’

ওলামাদের তরফ থেকে আমাদের জন্য এ কয়টি ইল্ম তলবের নির্দেশনামার স্বর্ণখন্ড ছিল। যা আমাদের সময় বাঁচাবার উদ্দেশ্যে আমাদেরকে তাঁরা উপহার দিয়ে গেছেন; যা তাঁদের জীবনে এক অভিজ্ঞতা ছিল। যাতে আমরা আমাদের ইল্ম ও জ্ঞানের বুনিয়াদ শক্ত ভূমিতে বদ্ধমূল করতে পারি। আর যথাসম্ভব ইল্মী স্বর্ণসৌধ নির্বিঘ্নে নির্মাণ করতে পারি। তাই তো আমাদের উচিত, আমরা যেন তাঁদের নির্দেশিত পথ হতে দূরে চলে না যাই। নচেৎ আমাদের ইল্মী পথে নানান্ বাধা, বিপত্তি ও বন্ধুরতা পরিদৃষ্ট হবে।

আল্লাহ তাআলা ইবনে আব্দুল বার্র এর উপর রহম করেন তিনি তাঁর যুগের শিক্ষার্থীদের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, ‘আমাদের এ যুগের ও এই দেশের শিক্ষার্থীরা তাদের সলফে সালেহীনদের পথ হতে দূরে সরে পড়েছে এবং ইল্ম অন্বেষণে এমন পথ অবলম্বন ও পছন্দ করেছে যা তাদের ইমামগণ জানতেন না। আর এ বিষয়ে বহু কিছু নতুন করে রচনা করেছে যার দ্বারায় তাদের মূর্খতাই প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রকৃত ওলামাদের মর্যাদা হতে তারা বহু নিম্নে রয়ে গেছে।’ *(জামে’ ২/১৬৯)*

ইবনুল জওযী (রঃ) শিক্ষার্থীদের জন্য এক পাঠ্যসূচী নির্দিষ্ট করে বলেন, ‘শিক্ষার্থীর শৈশবে প্রথমতঃ তাকে যে ভার দেওয়া হবে তা হচ্ছে, পাকাপোক্তভাবে কুরআন হিফ্য করা। কারণ, ঐ সময় হিফ্য তার রক্তে- মাংসে সংমিশ্রিত হয়ে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। অতঃপর নহু (আরবী ব্যাকরণ), অতঃপর মযহাব ও মতানৈকের উপর ফিক্হ। আর এরপর যা তার দ্বারা হিফ্য করা সম্ভব তা করলে খুবই উত্তম।’ *(সাইদুল খাতের ২৪৪পৃঃ)*

এই সূচীর উপর হাদীস ও তার মুস্তালাহ্র ইল্মকে যোগ করা যায়। যাতে তার ফিক্হ (ধর্মীয় জ্ঞান) কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি

করে পূর্ণতা ও বিশুদ্ধতাপ্রাপ্ত হয় এবং তার সাহায্যে শিক্ষার্থী মর্যাদার সমুচ্চ শিখরে আসীন হতে পারে।

শায়খ আব্দুর রহমান সা’দী (রঃ) বলেন, ‘ফলপ্রসূ ইলম; যে ইলম হৃদয় ও আত্মাকে পবিত্র করে, ইহ-পরকালের সুফল দান করে -তা হচ্ছে আল্লাহর রসূল ﷺ এর বর্ণিত হাদীস, তফসীর, ফিকহ এবং মানুষের কালপাত্র ভেদে সেই সমস্ত আরবী (বা অন্যান্য ভাষায়) ইল্ম যা কুরআন, হাদীস প্রভৃতি বুঝতে সহায়ক হয়।

কিন্তু কোন্ কোন্ বই-পুস্তকের সাহায্যে ইলম অর্জন সহজ হবে তা নির্দিষ্ট করা অবস্থা ও দেশ অনুপাতে ভিন্ন হতে পারে।

আমাদের ধারণায় একটা মোটামুটি নির্দেশসূচী এই যে, শিক্ষার্থীর উচিত প্রতি ইল্মের সংক্ষিপ্তসার প্রথমতঃ হিফ্য করার প্রচেষ্টা করা। যদি শাব্দিকভাবে স্মৃতিস্থ করতে অক্ষম হয় তবে তার উচিত, তা বারবার এমনভাবে পড়া যাতে তার মূল অর্থ হৃদয়ে গাঁথা যায়।

এই সংক্ষিপ্তসার মুখস্থের পর অন্যান্য কিতাব-পত্র যেমন, ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী পুস্তক পড়বে; যা ঐ সংক্ষিপ্তকে বিশদরূপে হৃদয়ে বিকশিত করে তুলবে। (এবং এইভাবে মূলের সঙ্গে ব্যাখ্যার সম্পর্ক রেখে পড়লে ইল্ম স্মৃতিস্থ করা খুবই সহজ হবে।)

অতএব যদি শিক্ষার্থী আকিদায় আকীদাহ ওয়াসেতিয়াহ, সালাসাতুল ওসূল, কিতাবুত তাওহীদ ও আকীদাহ তাহাবীয়াহ যেমন ছোট ছোট কিতাব মুখস্থ করে, ফিক্হে মুখতাসারুদ দলীল, মুখতাসারুল মুকনে’, হাদীসে বুলূগুল মারাম, নহুতে আল আজরূমিয়াহ (বা হেদায়াতুন নহু) ইত্যাদি মুখস্থ করে এবং ঐ সমস্ত কিতাবের মূল বক্তব্য বুঝার চেষ্টা করে আর তার উপর ঐ সবের ব্যাখ্যা পুস্তক অথবা ঐ বিষয়ক কোন সাধারণ পুস্তক পাঠ করে তবে তার জন্য সব সহজ হয়ে যাবে।

কারণ, তালেবে ইলম যখন ওসূল (মূল) মুখস্ত করে এবং তা বুঝতে

যদি সক্ষমতা লাভ করে তবে তার জন্য ঐ বিষয়ক ছোট বড় কোনও কিতাব পড়তে বা বুঝতে কোনই অসুবিধা হয় না। আর যে মূল হারাবে সে সফলকাম হবে না।

অতএব যে ব্যক্তি দ্বীনী ফলপ্রসূ ইলমের প্রতি লোভ রাখে এবং তার সন্ধানে আল্লাহর সাহায্য নেয়; আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন এবং তার ইলমে ও চলার পথে বর্কত দান করেন। আর যে ব্যক্তি ইলমের সন্ধানে উপকারী পথ ত্যাগ করে অন্য পথে চলে, তার কেবল সময়ই বরবাদ হয় এবং কষ্ট ব্যতীত অন্য কিছু লাভ হয় না। যেমন সকলের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষে তা বিদিত।' *(ফাতওয়া সা'দিয়াহ ৩০-৩১পৃঃ)*

শায়খ (রঃ) এর তরফ হতে এটি একটি সুচিন্তিত অভিমত যা যত্ন ও মান্য করার উপযুক্ত। ওলামাদের জীবনী পড়লেও দেখা যায় তাঁরা এই পথ হতে কেউই বিচ্যুত হননি; যে পথে তাঁরা মর্যাদার শেষ মঞ্জিলে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

এখানে তালেবে ইলমকে জেনে রাখা উচিত যে, ফিক্‌হের উপর ঐ কিতাব মুখস্থ করায় আমাদের উৎসাহ দান নিন্দিত অন্ধানুকরণ বা তকলীদের প্রতি আহ্বান নয়। বরং আমাদের ঐ অনুপ্রেরণা দান কয়েকটি লাভের জন্য। যেমন, ঐ হিফ্‌যে শিক্ষার্থী ঐ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একটা শক্ত বুনিয়াদের মালিক হবে। এবং ঐ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় লিখিত সমস্ত মাসআলা (সমস্যা) তার স্মৃতিস্থ হবে। যাতে ভবিষ্যতে অন্যান্য মাসায়েল তার নিকট তালগোল খেয়ে না যায় এবং প্রত্যেক আহকামের মধ্যে পার্থক্য নির্বাচন করতেও সক্ষম হয়। যেমন, পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে ইজতেহাদী মর্যাদায় উন্নত হতে সে প্রচেষ্টা করবে। আর এই সব সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা সেই সুউচ্চ আশার প্রতি সোপানাবলীর প্রথম সোপান।

আবার ঐগুলি মুখস্থ করার অর্থ, তার সবটার দ্বারা আমল করাও নয়।

যেহেতু তা পড়ার জন্য ওস্তাযের একান্ত প্রয়োজন; যিনি কঠিনকে সহজ করে বুঝিয়ে দেবেন। অস্পষ্ট বাক্যকে ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করে দেবেন। বিভিন্ন মতানৈক্যের মাঝে কোন্ মতটি সঠিক তা কিতাব, সুন্নাহ ও যুক্তির আলোকে পরিস্ফুটিত করে তুলবেন। অনেকে তো নিজেদের ফিক্‌হের আলোকে হাদীসের দূর-ব্যাখ্যা করেন অথবা খণ্ডন করেন কিন্তু ঐ সালাফী ওস্তায (সহীহ) হাদীসের আলোকেই ফিক্‌হ ও রায়ের খণ্ডন করবেন।

অবশ্য এই বিতর্ক ও আলোচনায় প্রবেশ করলে খুবই দীর্ঘতায় পড়ে যাব; যা আমরা চাইনা। তবে এই মর্মে মহান সুলেখক, সম্মানিত মুরব্বী, আল্লামাহ যাহাবী (রঃ) এর কতক উক্তি নকল করছি। যিনি প্রত্যেক মানুষকে তার সঠিক মর্যাদা দিয়ে বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ইজতেহাদের মর্যাদায় পৌঁছে যাবে এবং এর উপর তার জন্য কয়েকজন ইমাম সাক্ষি দেবেন তার জন্য তকলীদ বৈধ নয়। যেমন, যে ব্যক্তি ফিক্‌হ পড়তে শুরু করেছে এবং যে সাধারণ ব্যক্তি পুরা অথবা কিছু কুরআন হিফ্‌য করেছে তার জন্য ইজতেহাদ আদৌ বৈধ নয়। সে কেমন করে ইজতেহাদ করতে পারে? কি বলবে সে? কার উপর ভিত্তি করবে? কেমন করে উড়বে সে, যার এখনো ডানা গজায়নি?

আর তৃতীয় প্রকার মানুষ, যিনি ফিক্‌হ পড়ে শেষ করেছেন, সজাগচিত্ত ও সমঝদার মুহাদ্দিস মানুষ, যিনি ফরু’ (গৌণ আহকামের) সংক্ষিপ্ত পুস্তকাদি এবং ওসূল (মূখ্য)-এর নিয়মনীতি হিফ্‌য করেছেন, নহু পড়েছেন, ফাযায়েলে শরীক হয়েছেন এবং সাথে সাথে কুরআন মাজীদ হিফ্‌য করেছেন, তার তফসীর ও ভাবালঙ্কার অধ্যয়নে রত হয়েছেন তিনিই এক নির্দিষ্ট ইজতেহাদের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছেন। তিনিই ইমামগণের দলীলসমূহের উপর চিন্তা-গবেষণা ও বিচার-বিবেচনা করার উপযুক্ত হয়েছেন। তাই যখনই কোন মাসআলায় (সমস্যায়) তাঁর নিকট

হক ও সঠিকতা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠবে এবং তাতে নস্ (পাকা, স্পষ্ট ও অকাট্য দলীল) প্রমাণিত হবে এবং প্রসিদ্ধ ইমামদের মধ্যে কেউ তার উপর আমল করে থাকবেন---- তখনই তার অনুসরণ করবেন, আর সেটাই সঠিক। ফাঁক খোঁজার পথে চলবেন না। (অর্থাৎ যে বিষয় করতে হবে বলে প্রমাণিত সে বিষয়ে কারো মতানুযায়ী না করার ছাড় বা অনুমতি থাকলে তা গ্রহণ করবেন না।) আর সংযমশীলতা অবলম্বন করবেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর নিকট দলীল স্পষ্ট ও প্রমাণিত হবার পর তাঁর জন্য আর কারো তকলীদ (অন্ধানুকরণ) করার প্রশস্ততা নেই।'

অতত্রব আল্লাহ তাঁকে রহম করেন; যিনি নিজের আত্মার কদর জেনেছেন এবং তাকে তার নির্দিষ্ট মর্যাদাধাপের উর্ধ্বে উত্তোলন করেননি। যিনি সলফে-সালেহীনদের পথ ও পদ্ধতিমতে ইল্ম অনুসন্ধান করেছেন। তিনিই সকলকাম ইনশা-আল্লাহ।

অবশ্য ইলমের এই লম্বা ফিরিস্তি দেখে তালেবে ইলমের ঘাব্ড়ে যাওয়া উচিত নয়। কারণঃ-

'এক পা দুই পা করি ধীরে ধীরে অগ্রসরি
করে নর অতি উচ্চ গিরি উল্লঙ্ঘন।'

তাছাড়া মাদ্রাসার সিলেবাসে এ ধরনের সিস্টেম না থাকলেও মান্তেক, ফালসাফা প্রভৃতির উপর বৃথা সময় ব্যয় না করে অন্যান্য তফসীর ও হাদীস বিষয়ক পাঠ্যসূচীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে উপরোক্ত ফিরিস্তি অনুযায়ী চলতে পারলে ইনশাআল্লাহ বড় আলেম হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে।

ষষ্ঠ বাধা

অহংকার ও গর্ববোধ

পাপ ও আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা শরয়ী ইল্‌মের পথে এক প্রতিবন্ধক। যেহেতু ইল্‌ম আল্লাহর নূর (জ্যোতি)। তিনি যার হৃদয়ে ইচ্ছা সেই নূরকে বিচ্ছুরিত করে থাকেন। পরন্তু পাপ অন্ধকার। আর আলো ও অন্ধকার একই স্থানে, একই হৃদয়ে একত্রিত হতে পারে না। এই জন্যই হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, ‘আমার ধারণা যে, কোন কৃতপাপের ফলেই মানুষের জ্ঞাত ও অর্জিত ইল্‌ম বিস্মৃত হয়ে যায়।’ *(জামে’ ১/১৯৬)*

ইমাম শাফেয়ী বলেন, ‘আমি (আমার ওস্তাদ) অকী’ (রঃ) এর নিকট স্মরণশক্তির স্বল্পতার অভিযোগ করলাম, তিনি আমাকে পাপকর্ম (সর্ব প্রকার ধর্মীয় অবাধ্যতা) ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন এবং আমাকে জানালেন যে, ইল্‌ম আল্লাহর নূর। আর আল্লাহর নূর কোন অবাধ্য গোনাহগারকে উপহার দেওয়া হয় না।

পাপের সবটাই নিকৃষ্ট। তন্মধ্যে তালেবে ইল্‌ম, শিক্ষার্থী বা আলেমরা অধিক যে নিকৃষ্ট পাপে জড়িত তা হচ্ছে, অপরকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছজ্ঞান, অহংকার, আত্মগর্ব ও হামবড়াই। তাই তো অনেকে ‘বড়াই’ এর ময়দানে নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন এবং তাঁর মন অথবা অবস্থা বলে, ‘হাম জ্যায়সা কোঈ নেহী!’ এইভাবে লেবাসে, আচরণে, চলনে, বলনে, ভাবে, ভঙ্গিমায় নিজের আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করে তোলেন। যা আল্লাহ পাক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَلاَ تُصَعرْ خَدكَ لِلناسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً، إِن اللهَ لاَ يُحِب كُل مُخْتَالٍ فَخُوْر﴾

অর্থাৎ, অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। কারণ, আল্লাহ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে ভালোবাসেন না। *(কুঃ ৩১/১৮ আয়াত)*

অন্যথায় বলেন, “এ পরলোক যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। মুত্তাকী

(সাবধানী)দের জন্য শুভপরিণাম।” *(কুঃ ২৮/৮৩)*

সহীহায়নে আবুহুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “কোন এক সময়ে এক ব্যক্তি (এক প্রকার সুন্দর) জামা পরিধান করে (কোন পথে) চলছিল। যাতে সে মনে মনে বড় গর্ব অনুভব করছিল। যার মাথার কেশ ছিল বিন্যস্ত। চলনে ছিল অহংকার। এমতাবস্থায় আল্লাহ পাক তাকে নিয়ে ভূমি বিধ্বস্ত করলেন। সে কিয়ামত অবধি ঐ ভূমি নীচে প্রবিষ্ট হতেই থাকবে।” *(বুখারী, মুসলিম প্রমুখ)*

ইবনুল জওযী বলেন, ‘ইল্‌ম অধিক অধিক বর্ধিত করা উত্তম কাজ। কারণ, যে ব্যক্তি মনে করে যে, সে যা শিখেছে তাই যথেষ্ট, সে নিজেরই রায় ও অভিমতকে সঠিক ও অদ্বিতীয় মনে করবে। তখন সে নিজেকেই বড় ভাববে এবং ঐ ভাবনা অন্যান্য ইল্‌মী উপকার লাভ করা হতে বাধ সাধবে। আবার প্রকৃত সঠিকতা ও শুদ্ধতা হতে বঞ্চিত হবে ওই অহম্ চিন্তায়।’

আলী বিন সাবেত সত্যিই বলেছেন, ‘ইলমের আপদ অহংকার ও ক্রোধ এবং সম্পদের আপদ অপচয় ও অযথা ব্যয়।’

মুজাহিদ বলেন, ‘লাজুক ও অহংকারী ইল্‌ম লাভ করতে পারে না।’ *(বুখারী, দারেমী)*

আইয়ূব সখতিয়ানী বলেন, ‘আলেমের জন্য উচিত, আল্লাহর জন্য বিনয় প্রকাশ করে মাথার উপর মাটি রাখা।’

অনেকে বলেছেন, ‘নম্র ও বিনয়ী শিক্ষার্থী (তালেবে ইল্‌ম) এরই অধিক ইল্‌ম থাকে। যেমন অন্যান্য জমি হতে নিচু জমিতেই পানি অধিক থাকে।’

একজন হাকীম (বিজ্ঞলোক)কে প্রশ্ন করা হল, এমন কোন্ সম্পদ আছে যার উপর তার মালিকের প্রতি কেউ হিংসা করে না? তিনি বললেন, ‘বিনয়।’ প্রশ্ন করা হল, ‘এমন কোন বালা আছে যার উপর

বালাগ্রস্তকে দয়া প্রদর্শন করা হয় না?’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘ অহংকার।’

সুতরাং তালেবে ইল্‌মের ও আলেমের উচিত, নিজ ইল্‌ম নিয়ে কোন প্রকারের গর্ব ও অহংকার না করা। যেহেতু তা এমন এক নিকৃষ্টতম আচরণ যার ফলে আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন, মুমিনরাও রাগান্বিত হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নম্র ও বিনয়ী হবে আল্লাহ তাকে উন্নীত করবেন। পক্ষান্তরে যে তাঁর জন্য বিনয়ী হবে না তাকে তিনি অবনমিত করবেন।’

যদি এ ধরনের কোন গর্ব-চিন্তা কারো মনে জাগরিত হয় তবে তাকে তার পরিণাম ও কুফল স্মরণ করা উচিত এবং ভাবা উচিত যে, তার থেকে কত বয়োকনিষ্ঠ আছে যারা তার চেয়ে ইলমে অনেক বড়।

এযুগে কিছু লোকের এমন বিপত্তি প্রকাশিত হয়েছে যারা একটি বা দু’টি কিতাব (উর্দু ফিক্‌হ বা অন্য কোন কিতাব) পড়ে নিয়েছে, কিছু মসআলা হিফ্‌য করেছে, তারপর দু’দিন পরেই মুজতাহিদ হয়ে ফতোয়া দিতে শুরু করেছে। আবার এই নীচ খেয়াল হতেই শেষ নয়; বরং তারা প্রকৃত ওলামাদের চেয়ে নিজেদেরকে বড় ও অধিক জ্ঞানী ভাবতে বসেছে এবং নিজ দ্বারাই নিজেকে সবার চেয়ে উঁচু আসনে আসীন করেছে। যে আসন তার ধারণায় অন্য কেউ পাবার যোগ্য নয়। যে মনোভাব তাদের লেবাসে-পোশাকে, চলনে-বলনে ও ধর্মীয় বিতর্ক লুফায় প্রকাশ পায়। যেখানে প্রকৃত আলেম চুপ থাকেন সেখানে তাদের অনেকেই ফতোয়ার মুখে খই ফুটিয়ে থাকে। (ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজেঊন)।

এমন মুন্‌শীদের দ্বারা কত যে ক্ষতি হতে পারে, এবং কোন লাভ যে হতেই পারে না তাছাড়া তারা যে কত মূর্খ তা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ যেন তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। আমীন।

ঐ প্রকৃতি ও আচরণের নীম আলেমদের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লামা ইবনুল জওযী (রঃ) বলেন, ‘বহু ওলামা ও আবেদের উপর সমালোচনা করা হয়েছে যে, তারা অহংকার গুপ্ত রাখে (তারা মনে মনে গর্বিত)। কেউ নিজকে উচ্চপদস্থ ভাবে এবং তার থেকে কেউ বড় হোক তা চায় না। কেউ আবার দরিদ্র রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করে না। মনে করে সে তার চেয়ে অনেক উত্তম। এদের অধিকাংশই অহংকারী। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, তারা গর্ব করে কি নিয়ে?

যদি ইলম নিয়ে করে, তবে তার থেকে কত বড় আলেম অগ্রগামী আছেন। আর যদি ইবাদত নিয়ে করে তবে তার চেয়ে কত বড় আবেদও অগ্রণী আছেন। পরন্তু যে ব্যক্তি নিজের আচরণ ও পাপ পরিদর্শন করে থাকে সে জানতে পারবে যে, নিঃসন্দেহে সে পাপ ও ঔদাস্যে বাস করে। আর সে অপরের অবস্থা সম্পর্কে সন্দিহান থাকবে।’

অতএব সতর্কতার বিষয় যে, আত্মগর্বানুভব করা এবং পরকালের বিষয়ে নিজেকে অগ্রগামী ভাবা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও সর্বনাশী জিনিস। সেহেতু প্রকৃত মুমিন এসব বিষয়ে নিজেকে তুচ্ছ মনে করে।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রঃ)কে বলা হল, ‘আপনার ইন্তেকাল হলে আপনাকে রসূল ﷺ এর হুজরায় সমাধিস্থ করব কি?’ তিনি বললেন, ‘আমি নিজেকে তার উপযুক্ত মনে করার (পাপের) চেয়ে শির্ক ব্যতীত সর্বপ্রকার গোনাহ নিয়ে আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করা আমার নিকট পছন্দনীয়।’ *(সাইদুল খাতের ২৮-২পৃঃ)*

‘তাহযীবুল ইহ্‌য়্যা’তে বলা হয়েছে, ‘ইল্‌ম নিয়ে অহংকার ও ফখর সব চেয়ে বড় আপদ এবং মারাত্মক ব্যাধি; যাতে অত্যন্ত প্রচেষ্টা ও কঠিন পরিশ্রম ব্যতীত কোন চিকিৎসাই ফলপ্রসূ হয় না। কারণ, ইলমের কদর ও মর্যাদা আল্লাহর নিকট বিরাট বড়। আর মানুষের নিকটেও ধন-

দৌলত ও রূপ-সৌন্দর্য অপেক্ষা ইল্‌মই উৎকৃষ্টতম।’

দু’টি জিনিস জানা ছাড়া কোন আলেমই মন হতে গর্ব ও অহংকার মুছে ফেলতে পারেন না। প্রথমতঃ- জানা উচিত যে, আহলে ইলমের উপর আল্লাহর হুজ্জত (শাস্তির প্রমাণ) অধিক শক্ত। তিনি জাহেলদের ব্যাপারে যা সহ্য করবেন তার এক দশমাংশ আলেমদের ব্যাপারে সহ্য করবেন না। কারণ, জেনেশুনে আল্লাহর অবাধ্যতা করে যে- সে জ্ঞানপাপীর অপরাধ অধিক গুরুতর ও নিকৃষ্টতর। যেহেতু আল্লাহর প্রদত্ত ইল্‌মী নেয়ামতের কদর সে করে না।

দ্বিতীয়তঃ জানা উচিত যে, গর্ব আল্লাহ ব্যতীত কারো জন্য উপযুক্ত নয়। তিনি ছাড়া কেউ গরিমার যোগ্যও নয়। তাই যদি সে গর্ব করে তবে আল্লাহর নিকট অবশ্যই সে ঘৃণ্য ও ক্রোধের পাত্র হয়ে যাবে। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “আল্লাহ বলেন, ‘সম্ভ্রম, ইজ্জত ও বিজয় আমার পরিধেয় বস্ত্র, গৌরব গরিমা আমার চাদর, অতএব (এতে) যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইবে আমি তাকে শাস্তি দেব।” *(মুসলিম)*

আল্লাহর রসূল ﷺ আরো বলেন, “সে ব্যক্তি বেহেশ্তে যাবে না যার হৃদয়ে ধূলিকণা পরিমাণও অহংকার থাকবে।” তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, ‘যদি কোন মানুষ চায় যে, তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক তাহলে?’ তিনি বললেন, “আল্লাহ সুন্দর, সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার হল হক (ন্যায় ও সত্য)কে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য (ও ঘৃণা) করার নামান্তর।” *(মুসলিম, প্রমুখ)*

সপ্তম বাধা

ফল লাভে শীঘ্রতা

কিছু তালেবে ইল্‌ম মনে করে যে, ইল্‌ম যেন 'ভাতের থাবা বা পানির ঢোক'; যা সহজেই গিলে ফেলা যায়। অতিশীঘ্রই ইল্‌ম ফল দান করে এবং তার বিভিন্ন উপকার পরিদৃষ্ট হয়।

তাই মনে মনে ধারণা রাখে যে, এক বছর বা তার কিছু কম-বেশী সময়ের মধ্যেই সে একজন বড় আলেম হয়ে যাবে। অথচ এমন ধারণা ও চিন্তাধারা সত্যই ভ্রান্ত এবং অমূলক কল্পনা, অবান্তর আশা ও অবাস্তব স্বপ্ন; যার ক্ষতি অতি ভয়ঙ্কর এবং বিঘ্ন অতি বড়।

যেহেতু এমন অবস্থায় সে এমন কাজ করবে যার পরিণাম অতি নিন্দনীয়। যেমন, বিনা ইল্‌মে আল্লাহর উপর কথা বলবে, (আল্লাহ যা নন, যা বলেননি তা বলবে), নিজের উপর অন্ধবিশ্বাসী ও অসমীচীন নির্ভরশীল হয়ে বসবে, সম্মান ও নেতৃত্ব পছন্দ করতে লাগবে এবং এতটুকুতেই ক্ষান্ত শান্ত হয়ে ইল্‌ম ও আহলে ইল্‌মদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে বসবে।

একদা এক মসজিদে জামাআতে উপস্থিত হলাম। নামায শুরু হতে যাবে এমন সময় পাকা মেঝের উপর কিছু বিছিয়ে নামায পড়তে হবে কি না তা নিয়ে মুসল্লীদের মাঝে মতভেদ দেখা দিল। একদল বলল, 'বিছাতে হবে।' অপর দল বলল, 'দরকার নেই।' এমন সময় ঐ গ্রামের একজন চট্‌ করে বলে উঠলেন, '﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ মুসাল্লা বিছিয়ে নামায পড়তে হবে!'

এই প্রকারের তালেবে ইল্‌ম ও আলেমদের প্রতি বিদ্রূপ করে মামুন বলেন, 'ওদের কেউ কেউ তিন দিন হাদীস সন্ধান করে (পড়ে) এবং তার পরই বলে আমি আহলে হাদীস!' *(সিয়ার ১০/৮৭৬)*

সলফে সালেহীনদের জীবনী পাঠককে বিদ্যার্জনের উপর তাঁদের

অসীম ধৈর্য ও দীর্ঘ প্রয়াস দেখে সত্যই বিস্মিত হতে হয়। যাঁদের জ্ঞানের পথের কোন শৈথিল্য ও বিশ্রাম নেই এবং না তাঁরা গভীর পান্ডিত্যের উপর কোন প্রকার গর্ব বোধ বা প্রকাশ করেন। তাঁদের এই অবিরাম বিদ্যালোচনার শ্লোগান যেন, 'ক্রোড় হতে গোর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর।'

ইমাম ইবনুল মাদীনী (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'এত সমস্ত ইল্‌ম আপনি কেমন করে সঞ্চয় করলেন?' তিনি উত্তরে বললেন, (মিথ্যা) ভরসা ছেড়ে, দেশ বিদেশে সফর করে, জড়ের ধৈর্যের ন্যায় ধৈর্য ধরে এবং কাকের ন্যায় কাকভোরে বাসা ছেড়ে।' *(তাযকিরাহ)*

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তিই এ বিষয়ে ততক্ষণ সফলতায় পৌঁছতে পারে না যতক্ষণ না সে দারিদ্র্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তার (ইলমের সন্ধান) তার সবকিছুকে প্রভাবান্বিত করে ফেলেছে।' *(আস্‌সিয়ার ১০/৮৯)*

ইমাম হামযা বলেন, 'ইমাম হাফেয ইয়াকূব বিন সুফিয়ান আমাকে বলেছেন, ইল্‌ম সন্ধানের সফরে আমি ত্রিশ বছর কাটিয়েছি।' *(তাযকিরাহ)*

ইয়াহয়্যা বিন আবী কাসীর বলেন, 'দৈহিক আরামে ইল্‌ম হাসিল হয় না।' *(জামে' ১/৯১)*

ইবনুল হাদ্দাদ মালেকী বলেন, 'বিলাস শয্যার সাথে আলেমের সম্পর্ক কি?' *(আস্‌সিয়ার ১৪/২০৬)*

এ বিষয়ে হযরত মূসা (আঃ) এর ইল্‌মী সফরের কথা উল্লেখ্য; যাতে সময় দৈর্ঘ্যতা, কষ্ট ও ধৈর্যের সাথে ইল্‌ম অর্জন করার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যখন হযরত মূসা (আঃ)কে আল্লাহ পাক নির্দেশ করেছিলেন যে, সমুদ্র সঙ্গমস্থলে এক বড় আলেম বান্দা আছে তার নিকট উপস্থিত হয়ে ইল্‌ম অনুসন্ধান কর। হযরত মূসা (আঃ) তাঁর সন্ধানে বের হলেন। সফরে সঙ্গীকে বললেন, 'দুই সমুদ্রের মধ্যস্থলে না পৌঁছে আমি থামব না, আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।' *(কুঃ ১৮/৬০)*

সে ইলম সফরে তাঁরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন এবং এক স্থানে সাথীকে বললেন, 'আমাদের নাশ্‌তা আন, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' *(ঐ ১৮/৬২)*

অতঃপর অনুসন্ধানের পর যখন ওস্তাদের সাক্ষাৎ পেলেন তখন তাঁকে বললেন, 'সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দেবেন এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি?'

তিনি তাঁকে ধৈর্যের উপর সতর্ক করে বললেন, 'তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবে না----।' *(ঐ ৬৬-৮২ আয়াত)*

অতএব তালেবে ইলমের উচিত, ঐ সমস্ত ইমামগণের অনুসরণ করা। ইল্‌মী সফরে তাঁদের ধৈর্য ও সহ্যের কথা স্মরণ করে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে ঐরূপ ইলম তলব করা, যাতে সে তাতে সফল মনোরথ হতে পারে। যেহেতু তাঁদের অধ্যয়ন নীতি ছিল অভ্রান্ত, বিদ্যার্জনের পদ্ধতি ছিল উত্তম। তাঁদের যে সুনাম হয়েছে এবং মুসলমানদের যে চির উপকার ও মঙ্গল সাধিত হয়েছে তা কেবলমাত্র জ্ঞানার্জনের পথে অনল্প সময় ও অর্থ ব্যয়কে তুচ্ছজ্ঞান করারই ফলশ্রুতি।

পরিশেষে একটি আলাপন নোট করছি যদ্দ্বারা ইলমের মূল্যমান, তার সুউচ্চ মর্যাদা এবং তা সেই ব্যক্তিই অর্জন করতে সক্ষম হয় যে তার পথে সবকিছু উৎসর্গ করে -সে সব কথা আমরা জানতে পারব। যেমন বলা হয়, 'ইল্‌মকে তুমি তোমার সবকিছু দাও তবে সে তোমাকে তার কিছু অংশ দেবে।'

আলাপনটি নিম্নরূপঃ-

এক ব্যক্তি অপরকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ভাবে ইল্‌ম অর্জন করেছ?'

দ্বিতীয় লোকটি উত্তরে বলল, 'অধ্যয়ন শুরু করলাম, দেখলাম তা (ইল্‌ম) আশা হতে বহু দূরে; যা তীর দ্বারা শিকারও করা যায় না, স্বপ্নেও দেখা যায় না। পিতা-পিতৃব্য হতে তার ওয়ারিসও হওয়া যায় না।

অতঃপর তার জন্য দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করলাম, পাথরে হেলান দিয়ে অবিরাম রাত্রি জাগরণ করলাম, বহু দৃষ্টি, স্মৃতি ও চিন্তাশক্তি ব্যয় করলাম, একের পর আর এক সফর করলাম, বহু বিপদের সম্মুখীন হলাম এবং তার কিছু মাত্র অর্জন করলাম; যা কেবল গোড়াপত্তনের যোগ্য! যদ্দ্বারা (ইল্‌মের বীজ) বপন করা যায়; যা হৃদয়েই বপন করতে হয় এবং দর্স ও অনুশীলন দ্বারা তার সিঞ্চন করতে হয়।

তুমি কি মনে কর, যে দিবসে বন্ধু-বান্ধবের সহিত জমায়েতে মশগূল থাকে, রজনীতে স্ত্রী সংসর্গে উন্মত্ত থাকে সে কি ফকীহ হতে পারবে? আল্লাহর কসম! কোন দিন না।

ইল্‌ম তারই হতে পারে যে খাতা-কলম সাথে করে সফর করে এবং অর্জনের পথে দিবারাত্র নিরলস প্রচেষ্টা জারী রাখে।’ *(মাকামাত বদী’)* কারণ, (**العلم صيد، والكتابة قيد**) অর্থাৎ, ইল্‌ম হল (পলায়নরত) শিকারের ন্যায়। আর লিখে নেওয়া হল তার বেড়ি স্বরূপ।

আশা করি যে, এই ছোট মূল্যবান আলাপনে সেই সমস্ত তালেবে ইলমদের ভুল ধারণা ভেঙ্গে যাবে যারা মনে করে, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সে সব ইল্‌ম (অন্ততঃপক্ষে পেট চালানোর মত!) হাসিল করে ফেলবে। ফলে চেষ্টা তো করে যায় কিন্তু সাধনাকে তুচ্ছজ্ঞান করে। আর মনে করে, এর পরই আল্লাহ তাদের জন্য ইলম ও মা’রেফাতের দরজা সম্পূর্ণ খুলে দেবেন এবং তারা ইল্‌ম ও হেদায়েতের (নাকি শুধু মসজিদের) ইমাম হয়ে উঠবে! অথচ কবি বলেন,

أخى لن تنال العلم إلا بستة + سأنبئك عن تفصيلها ببيان
ذكاء وحرص وإجتهاد وبلغة + وإرشاد أستاذ وطول زمان

অর্থাৎ, ইল্‌ম তলবে ছয়টি জিনিস অবশ্যই জরুরী; বুদ্ধিমত্তা, আগ্রহ ও আসক্তি, প্রচেষ্টা, প্রয়োজনীয় রসদ, ওস্তাদের সাহচর্য এবং দীর্ঘ সময়।

অন্য এক কবি বলেন,

بقدر الكد تكتسب المعالي + ومن طلب العلا سهر الليالي
ومن رام العلا من غير كد + أضاع العمر في طلب المحال
تروم العز ثم تنام ليلاً + يغوص البحر من طلب اللآلي
تركت النوم ربي في الليالي + لأجل رضاك يا مولى الموالي
فوفقني إلى تحصيل علم + وبلغني إلى أقصى المعالي

অর্থাৎ, মেহনত অনুপাতে মর্যাদা লাভ হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি উন্নতি খোঁজে তার উচিত, রাত্রি জাগরণ করা। যে ব্যক্তি বিনা পরিশ্রমে উন্নতি কামনা করে সে তো দুর্লভ বস্তুর সন্ধানে আয়ু ক্ষয় করে। তুমি ইজ্জত চাইবে অথচ রাত্রে ঘুমিয়ে থাকবে (এ তো হতে পারে না)। কারণ, যে মণি-মুক্তা পেতে চায় তাকে তো সমুদ্রে ডুব দিতে হবে।

হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রাত্রিসমূহে নিদ্রা বর্জন করেছি হে সকল প্রভুদের প্রভু! তাই আমাকে ইলম অর্জন করার প্রেরণা দান কর এবং মর্যাদার শেষ চূড়ায় পৌঁছে দাও।

আর দীর্ঘ সময় বা পথ দেখে পিছপা হওয়া উচিত নয়।

'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ,
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?'

ومن جد وجد، ومن زرع حصد، وعند الامتحان يكرم الرجل أو يهان.

অষ্টম বাধা

হীনম্মন্যতা

শিক্ষিত ও আলেম সমাজে এমন অনেক মানুষ নজরে পড়েন, যাঁরা অসাধারণ প্রতিভার মালিক, অগাধ পান্ডিত্য এবং অনল্প ইল্‌মী শক্তির অধিকারী যা তাঁদেরকে জ্ঞানপতি হবার যোগ্য করে তুলে। কিন্তু হেয় মন্যতায় তাঁদের সে প্রতিভার আভা ও আলোক বিলীন হয়ে যায় এবং তেজস্বান শক্তিকে ক্ষীয়মান ও নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। তাই তো স্বল্প ইল্‌ম আলোচনায় তাঁদের জ্ঞান-পিপাসা মিটে যায়। অধিক অধ্যয়ন ও বাড়তি পড়াশুনা করায় বিরাগী হন এবং ইল্‌মী কাজ ছেড়ে সাধারণতঃ পার্থিব কোন কাজে অধিক মনোযোগী হন। তাঁদের অনেককে (বক্তৃতা লেখনী বা অন্যান্য) দাওয়াতী কাজে নামতে অনুরোধ করলে ‘আমার যোগ্যতা নেই’ বলে ওজর পেশ করেন। তাঁরা মুখে বিনয় প্রকাশ করেন এবং কাজেও। অথচ কাজে তা প্রকাশ করা আদৌ উচিত নয়।

তাই তো এমন মানুষদের প্রতিভা ও শক্তি খুব সত্বর ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং তাঁদের সময়ের বর্কত তুলে নেওয়া হয়। যেহেতু অকৃতজ্ঞতা ও অবহেলার ফলে সম্পদ লয় ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; যেমন কৃতজ্ঞতা ও মর্যাদাদানে সম্পদ বর্ধমান হয়।

ফার্রা (রঃ) বলেন, ‘দুই ব্যক্তির মত অপর কাউকে আমি দয়া প্রদর্শন করি না। এক ব্যক্তি, যে ইলম তলব করে; কিন্তু তার মেধা বা বুঝশক্তি নেই। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি, যে মেধাবী ও বুঝ শক্তিসম্পন্ন; অথচ ইলম তলব করে না। আর আমি আশ্চর্যান্বিত ও বিস্মিত হই এমন লোকের উপর যার ইল্‌ম অর্জন (ও প্রচার) করার ক্ষমতা আছে; অথচ তা করে না।’

মুতানাব্বী বলেন, **ولم أر في عيوب الناس عيباً + كنقص القادرين على التمام**

অর্থাৎ, মানুষের সবচেয়ে বড় ত্রুটি এই যে, পূর্ণতা লাভের সামর্থ্য থাকা

সত্ত্বেও সে অপূর্ণ থেকে যায়।

এর টীকায় ইবনুল জওযী (রঃ) বলেন, 'জ্ঞানীর উচিত, যথাসম্ভব (কল্যাণমূলক) পরিপূর্ণতার সর্বশেষ মঞ্জিলে পদার্পণ করা। তাই যদি কোন মানুষ আকাশে চড়ার পরিকল্পনা করে (এবং তার দ্বারা তা সম্ভব হয়) তবে মাটিতে বসে থাকা তার সবচেয়ে বড় আয়েব ও ত্রুটি হবে।

নবুয়ত যদি ইজতেহাদ ও প্রচেষ্টার দ্বারা লাভ করা সম্ভব হত তবে অলস ব্যক্তিকেও তা লাভ করার প্রচেষ্টায় বড় মজবুত দেখা যেত। (অর্থাৎ কেবল বেলায়ত নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা তার জন্য সমীচীন হত না।)

জ্ঞানী ও পন্ডিতদের এক সদাচরণ হল, ইল্‌ম ও আমলে যথাসম্ভব পরিপূর্ণতার সর্বশেষ মঞ্জিলকে আত্মার জয়লাভ করা।'

তিনি আরো বলেন, 'মোটকথা, যে কল্যাণ ও মর্যাদা লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব তা লাভ ও অর্জন না করে ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ (এ বিষয়ে) স্বল্পতে তুষ্ট হওয়া নীচ, তুচ্ছ ও অলস মানুষের কাজ। অতত্রব এমন মানুষ হওয়া দরকার যার পা মাটিতে থাকলেও আকাশে ও গ্রহ-উপগ্রহে তার হিম্মত ও উঁচু অভিপ্রায় থাকে।

যদি প্রত্যেক আলেম ও আবেদের নিকট যাওয়া সম্ভব হয় তো যাও। তাঁদের নিকট সবক শিখ। তাঁরা মানুষ, তুমিও মানুষ। যা তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয়েছে তা তোমার দ্বারাও সম্ভব হতে পারে। কিন্তু যে বসে পড়ে, সে হীনম্মন্যতার ও হিম্মত হারানোর ফলেই বসে পড়ে।

তুমি নিজেকে কোন প্রতিযোগিতার ময়দানে ভাব। সময় আপন গতিবেগে চলতে আছে। সে তোমার অপেক্ষা করবে না। অতএব আলস্য ছাড়, দীর্ঘসূত্রতার জড়তায় পড়োনা। জেনে রেখো, যার যা হারিয়ে যায় তা তার নিজের অবহেলা ও অলসতার কারণেই যায় এবং যে যা পায় সে তার নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, হিকমত ও যত্নের

কারণেই পায়।’ *(সাইদুল খাতের ১৫৯- ১৬১পৃঃ)*

উল্লেখ্য যে, তকদীর সত্য; তবে তকদীরের দোহাই দিয়ে তদবীর ছেড়ে বসে যাওয়া জ্ঞানী মুসলিমের কাজ নয়। কারণ, তকদীরের সাথে তদবীরও জরুরী।

‘অদৃষ্টেরে শুধালাম, চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে?’
সে কহিল, ‘ফিরে দেখ।’ দেখিলাম থামি,
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি।’

সুতরাং তুমি যদি তোমার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা ও বুঝশক্তি আছে অনুভব কর তবে ইল্‌ম ও অধ্যয়নের বিকল্প অন্য কিছুকে মনে করোনা এবং দর্স ও তদরীস ব্যতীত অন্য কোনও কাজে লিপ্ত হয়ে যেওনা। যদি তা তুমি মানতে না চাও তবে (**إنـا لله وإنـا إليـه راجعـون.**) এ তোমার ও মুসলমানদের পক্ষে এক মহাবিপদ ও বড় নোকসান!

ধনলোভীর নিকট ধন ঈপ্সিত, মান ঈপ্সিত নয়। প্রজাপতির নিকট ফুল প্রিয়, ফল প্রিয় নয়। মাতালের কাছে মদই শ্রেষ্ঠ, দুধ শ্রেষ্ঠ নয়। অনুরূপ একজন আলেমের নিকট ইল্‌মই প্রিয় ও নেশার বস্তু হওয়া উচিত, অন্য কিছু নয়।

হে তালেবে ইল্‌ম! তোমার ঐ পথে চলতে বিভিন্ন বাধা পাবে, পদার্পণে কাঁটা পাবে, (অধার্মিকদের নিকট হতে) সম্মানের অভাব পাবে, আত্মীয়তা ছিন্ন হবে, ‘ফকীরী বিদ্যা’ বলে নাকসিটকানি শুনবে, দারিদ্র্য ও উত্তম খাদ্যাভাব দেখা দেবে, আমলের পথে লোকারণ্যেও নিজেকে নিঃসঙ্গ ও অসহায় পাবে। তবুও তোমাকে ঐ পথে চলতে হবে।

‘কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে।’

ধৈর্য ধরলে তার ফল মিষ্ট পাবে। যদি তুমি প্রকৃত তালেবে ইল্‌ম হও

তবে তোমার চলার পথে পদতলে ফিরিশ্তা পক্ষ বিছিয়ে যাবেন। তুমিই হবে প্রকৃত সুখী ও সম্মানী। যেহেতু যে রত্নের খোঁজে বের হবে সে রত্ন নবুয়তের রত্ন। আর তার চেয়ে মূল্যবান রত্ন আর কি আছে? আসুক শত বাধা, শত ঝঞ্ঝা, শত অপমান, তা তুচ্ছজ্ঞান করে চল। আর মনে রেখো, যাদের কোন মান নেই সাধারণতঃ তারাই জ্ঞানীদের অপমান করে। আবার যাদের কোন মানই নেই তাদের আবার অপমান কিসের? অতত্রব যদি তুমি দ্বীন ও নবুওত থেকে মান কুড়াতে না পার তবে অপমান আর কি? যদি মানের আশা কর তবে আল্লাহর কাছে, ধর্মপ্রাণ মুমিন মানুষ, জ্ঞানী ও সম্মানী লোকদের নিকট আশা কর। কাফের ও মূর্খদের তরফ হতে মানের আশা করো না। তাদের নিকট হতে তো মানের আকাঙ্খা করাই ভুল।

চল ঐ পথে বুক ফুলিয়ে, মাথা উঁচু করে, হিম্মত বড় করে। সেই কাজ ও আচরণ অবলম্বন কর যাতে তোমার হিম্মত বাড়তে থাকে। আশাকে বড় কর। সর্বদা ধ্যানে রেখো যে, তোমাকে বড় একটা কিছু হতেই হবে। ছোট আশা কোন সময় করো না। আল্লাহর নিকট চাইলে বড় কিছু চাও। 'কিছু না পারি তো মসজিদের ইমামতি করব' এমন ছোট খেয়াল মনে রেখো না।** যেখানে চাইলে গোটা ফুলবাগান পেতে পার সেখানে দু'টি ফুল চেয়ে ও পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

'মূর্খ তুমি গোটা কতক ফুলেই তোমার ভরল প্রাণ,
চাইতে যদি মিলত তোমায় সবটুকু এই ফুল বাগান।'

আশা করলে উচ্চ আশাই করতে হয়। কথায় বলে 'আশা আর বাসা ছোট করতে নেই।' অন্যথা যাদের মন ছোট কেবল তারাই ছোট আশা করে এবং নগণ্য নিয়ে সন্তুষ্ট হয়।

***এখানে মসজিদের ইমামতিকে ছোট কাজ হিসাবে দেখানো উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও দর্স ও তাদরীস থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল ইমামতি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা অনুচিত।*

চাও আল্লাহর কাছে বড় কিছু। যিনি তোমার চাওয়া ছোট কিছু দিতে পারবেন তিনি বড়টাও দিতে পারবেন। চাও এই বলেঃ-

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْماً، رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ، وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِيْ، يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ.
اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ وَزِدْنِيْ عِلْماً. اَللّٰهُمَّ فَقِّهْنِيْ فِي الدِّيْنِ.
اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ.

হিম্মত উঁচু করার যে সমস্ত উপায়-উপকরণ আছে ,তার মধ্যে সাহাবা ও সালেহীন (রাঃ)দের জীবনী পড়া অন্যতম। যেহেতু তাঁদের জীবন ইলম ও আমলে পরিপূর্ণ। তাঁদের অবস্থা জানার পর শিক্ষার্থী নিজেকে অনেক ছোট ভাববে এবং তার চোখেই তার ইল্ম ও আমল খুবই নগণ্য পরিদৃষ্ট হবে। ফলে তাঁদের নাগাল পাবার প্রচেষ্টা করবে এবং তাঁদের অনুকরণ ও সাদৃশ্যলাভ করার প্রয়াসী হবে। আর “যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অনুকরণ ও সদৃশতা অবলম্বন করে সে তাদেরই দলভুক্ত।”

ইবনুল জওযী বলেন, ‘আল্লাহ আল্লাহ! তোমরা সলফের জীবনেতিহাস আলোচনা কর। তাঁদের লেখনী ও সংবাদ পড়। কারণ, তাঁদের বই-পুস্তক অধিক অধ্যয়ন করা, তাঁদেরকে দর্শন করার শামিল।’

অন্যত্র তিনি বলেন, ‘অধিক পাঠ্যালোচনা ও বাড়তি পড়াশুনা করা উচিত। কারণ, তাতে (জ্ঞানী) সম্প্রদায়ের ইল্ম ও উঁচু হিম্মত পরিদর্শন করা যাবে; যাতে শিক্ষার্থীর মনোবল দৃঢ় হবে। আর তার ইচ্ছা ও আশা অধিক প্রয়াসের জন্য প্রবল বেগে আন্দোলিত হবে। *(সাইদুল খাতের ৪৪০পৃঃ)*

নবম ও দশম বাধা

দীর্ঘসূত্রতা ও সাধ

গয়ংগচ্ছভাব ও সাধ -এই দু’টিই হল মারাত্মক ব্যাধি। যা হৃদয় ও সময়কে ধ্বংস করে এবং মানুষকে স্বপ্ন ও কল্পনার জগতে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

দীর্ঘসূত্রতা হল কাণ্ডজ্ঞান, অনুভূতি ও পরোয়াহীন মানুষের বদ্‌গুণ। তাই তো এমন মানুষের মন যখন কোন ভালো কাজের ইচ্ছা করে তখনই দীর্ঘসূত্রতা তাকে বলে, ‘এই করব, এখনি যাচ্ছি, এখনি যাব, এখনো অনেক সময়’ ইত্যাদি। কিন্তু পরিশেষে যখন অকস্মাৎ জীবনের দুয়ারে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় তখন সে বলে, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলেন না কেন?’ *(কুঃ ৬৩/১০)*

সুতরাং তালেবে ইলমের উচিত, এই অপগুণ হতে বেঁচে থাকা। আজকের কাজ কালকের জন্য রেখে না দিয়ে স্বকর্তব্যের প্রতি যথার্থ যত্নবান হওয়া এবং ভালো ও শুভকাজে দেরী না করা। মহান আল্লাহ বলেন, “তোমরা সৎকার্যে প্রতিযোগিতা কর।” *(কুঃ ৫/৪৮)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿وَسَارِعُوْا إِلى مَغْفِرَةٍ منْ ربكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السموَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدتْ لِلْمُتَقِيْنَ﴾

অর্থাৎ, তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং জান্নাতের জন্য; যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। *(কুঃ ৩/১৩৩)*

যে চট্‌পট্‌ করে নৈপুণ্যের সাথে কাজ সারতে পারে প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ের কদর ও মূল্য বোঝে এবং সময়কে যথাযোগ্য ব্যবহার করে তদ্দ্বারা উপকৃত ও লাভবান হয়ে থাকে।

আল্লাহর নবী ﷺ আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) কে বলেছিলেন, “তুমি এমন ভাবে দুনিয়ায় অবস্থান কর যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা

পথিক।” আর ইবনে উমর (রাঃ) বলতেন, ‘সন্ধ্যা হলে সকালের প্রতীক্ষা (বা আশা) করো না। আর সকাল হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা (বা আশা) করো না। তোমার অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতার এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনের সুযোগ গ্রহণ কর।’ *(বুখারী, তিরমিযী, মিশকাত ১৬০৪নং)*

ইবনুল জওযী বলেন, ‘যে ব্যক্তি নিজের অন্তস্তলে জান্নাতের স্মরণ আবর্ত করবে, যেথায় কোন মৃত্যু নেই, কোন পীড়া নেই, নিদ্রা ও কোন চিন্তা নেই। যার বিলাস-সুখ নিরন্তর স্থায়ী ও অবিনাশী। এবং যেখানকার সুখের আতিশয্য এখানকার প্রয়াস ও পরিশ্রমের আধিক্যানুসারে হবে। সে ব্যক্তি এই সময়কে অতিমূল্যবান বলে মনে করবে। ফলে প্রয়োজনের অধিক ঘুমাবে না এবং কর্তব্যে উদাসীন হবে না।’ *(সাইদুল খাতের ৩২৩পৃঃ)*

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কিশোর অবস্থা থেকেই ইল্‌ম ও সময়ের এমন কদর করেছিলেন যে, পরবর্তীকালে তাকে ইল্‌মের দরিয়া ও উম্মতের পন্ডিত বলা হয়েছিল। একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, ‘কিভাবে আপনি এত ইলমের অধিকারী হলেন?’ তিনি বললেন, ‘প্রশ্নকারী জিহ্বা, সমঝদার অন্তর এবং বিশ্রামহীন শরীর দ্বারা ইল্‌ম পেয়েছি।’

সাধ ও কামনা -যার কিছু প্রশংসার্হ এবং কিছু নিন্দনীয়। প্রশংসার্হ সাধ হল, সৎ ও উত্তম কার্যের অভিলাষ করা এবং তা করতে সক্ষম না হওয়া; যার তিনটি শর্ত রয়েছে।

১- সেই কর্ম করার জন্য পাক্কা সংকল্প রাখা, যখনই তা করা সম্ভবপর হবে তখনই করার পূর্ণ ইচ্ছা রাখা।

২- তা শরয়ী (ধর্মীয়) গন্ডীভুক্ত হতে হবে। যেমন মসজিদ নির্মাণের কামনা করা।

৩- তা যেন মানুষের স্বভাব ও অভ্যাস না হয়।

নিন্দনীয় বাসনা প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়্যেম (রঃ), শাইখুল ইসলাম আবু

ইসমাইল হারাবীর অন্তর নষ্ট হওয়ার বিষয় সম্পর্কিত কথার ব্যাখ্যায় বলেন, ‘চিত্ত বিনষ্টকারী দ্বিতীয় বিষয় হল, বাসনার সমুদ্রে হৃদয়ের সন্তরণ করা, যে সমুদ্রের কোন কূল-কিনারা নেই। যে সমুদ্রে পৃথিবীর নিঃস্ব ও দরিদ্ররা সাঁতার কেটে বেড়ায়। যেহেতু নিঃস্বদের কেবল কামনাটাই সম্বল ও পণ্যদ্রব্য। শয়তানের প্রতিশ্রুতি ও প্রলোভন এবং অবাস্তব কল্পনা ও অলীক খেয়াল। যাদের সকল আশাই দুরাশা। মিথ্যা বাসনার তরঙ্গমালা এবং অমূলক কল্পনার ক্ষিপ্ত ঢেউ যাদেরকে নিয়ে খেলতে থাকে, যেমন কুকুর খেলে থাকে কোন পশুর শবদেহ নিয়ে। আর ঐ পণ্যদ্রব্য প্রত্যেক নিকৃষ্ট, দীন-হীন-ক্ষীন মানুষেরই যার এমন কোন হিম্মত ও উদ্যম থাকে না যদ্দ্বারা সে বাইরের বাস্তবতাকে ধারণ করতে পারে। বরং তার পরিবর্তে কেবল নিকৃষ্ট কামনাই সদা জাগরিত রাখে।

বাসনাকারী অভিলষিত বস্তুর ছবি নিজ মানসপটে অঙ্কন করে থাকে। কখনো বা কল্পনাকে বাস্তবজ্ঞান করে তার সাক্ষাৎলাভ করে থাকে এবং তা মনে মনে অর্জনও করে থাকে। তা নিয়ে সুখ আস্বাদন করে থাকে, আর মনের সাধও মিটিয়ে থাকে। কিন্তু এই ভাবোচ্ছ্বাস ও তন্ময়তায় কিছুকাল থাকার পর যখন তার ঘোর অথবা নিদ্রা ভঙ্গ হয় তখন হাত শূন্য দেখে এবং নিজেকে দেখে সেই জীর্ণশীর্ণ পাতার কুটীরে চাটাই এর বিছানায়।’ *(মাদারেজুস সালেকীন ১/৪৫৬)*

আবু তামাম কি সুন্দরই না বলেছেন, ‘যার ভাবনা, চিন্তা, কল্পনা ও ইচ্ছার চারণভূমি কামনা ও বাসনার উদ্যান হয় সে সর্বদা উপহাস্য থাকে।’

কোন পন্ডিতকে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘সবচেয়ে দুরবস্থাগ্রস্ত মানুষ কে?’ তিনি বললেন, ‘যার হিম্মত ভেঙ্গে গেছে, বাসনার গৃহ প্রশস্ত হয়েছে, উপকরণ হারিয়ে গেছে এবং সামর্থ্য কমে গেছে।’

অন্য এক জ্ঞানী বলেন, ‘কামনা হতে দূরে থাক। কারণ কামনা

তোমাদের মালিকানাভুক্ত বস্তুর সৌন্দর্য অপসারিত করে। আর তারই কারণে তোমাদের উপর আল্লাহ নেয়ামতকে তুচ্ছ ও ছোট জ্ঞান কর। *(আদাবুদ দুন্য়্যা অদ্দীন ৩০৮ পৃঃ)*

লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনার তীব্রতা হল ইল্‌ম ও জ্ঞানশিক্ষার পরিপন্থী। পড়ার জীবনেই যদি চাকরীর ধান্দা থাকে, অর্থ উপার্জনের ফিকির-ফন্দী থাকে তাহলে পড়াশুনা আর হবে না। অর্থের চিন্তা-ভাবনা ও টাকা-পয়সা অর্জনের লোভই তালেবের অধ্যয়নের উদ্যম নষ্ট করে ছাড়বে। কারণ, এ শ্রেণীর পার্থিব কামনা ও লালসায় মানসিক যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাবে, পড়াশুনায় চরম ব্যাঘাত ঘটবে এবং স্মরণশক্তির মারাত্মক ক্ষতি হবে। আর কথায় বলে, 'লোভেই পাপ, পাপেই মৃত্যু।'

সুতরাং এই পীড়া হতে বেঁচে থাকা তালেবে ইল্‌মের একান্ত কর্তব্য। সাবধান হওয়া উচিত, যাতে ঐ রোগের জীবাণু তার দেহে সংক্রমণ না করে বসে। যেহেতু এ ধরনের সাধ দুরারোগ্য ক্যানসার। আর খুব কম মানুষই ঐ রোগের হাত হতে রক্ষা পেয়ে থাকে। শত চিকিৎসা সত্ত্বেও তার করাল কবল হতে রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হয় না।

আল্লাহ আমাদের সকলকে ঐ ব্যাধি হতে রক্ষা করুন। আর মিথ্যা বাসনা হতে দূরে রেখে কল্পনার জগৎ হতে অপসারিত করে বাস্তব জগতে সৎকর্ম করার অনুপ্রেরণা, প্রয়াস ও ব্যাপৃতি দান করুন। আমীন।

একাদশ বাধা

ধৈর্যহীনতা

ধৈর্য হল তিন প্রকার; আগত বিপদে ধৈর্য, আল্লাহর নির্দেশিত ফরয পালনে ধৈর্য এবং তাঁর নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন করার উপর ধৈর্য। মানুষ তার জীবনে এ তিন প্রকার ধৈর্য ধারণ করলে মিঠা ফল লাভ করতে পারে। বিভিন্ন আপদে, বিপদে, আঘাতে, বাধাতে সবর করলে অবশ্যই মেওয়া ফলবে।

ইবনে হিশাম নহবী বলেন,

ومن يصطـبر للعـلم يظفر بنيله + ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل
ومن لم يذل النفس في طلب العلى + يسيرًا يعـش دهرًا طـويلاً أخـا ذل

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইল্‌মের খাতিরে ধৈর্যশীলতার পথ অবলম্বন করে সে তা অর্জন করতে সফলকাম হয়। কারণ, যে সুন্দরীকে বিবাহ করতে চায় তাকে বহু (মোহর ব্যয়ে ধৈর্য) ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আর যে ব্যক্তি ইল্‌ম অর্জনের পথে নিজে সামান্য লাঞ্ছনা স্বীকার করে না সে সুদীর্ঘ দিন ধরে লাঞ্ছিত হয়েই বাস করে।

পূর্বে যা কিছু কর্তব্যরূপে আলোচিত হয়েছে তা কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে হলে বিপুল ধৈর্য ও সহ্যের প্রয়োজন। ধৈর্য সহকারে উল্লেখিত বিষয় সমূহের সঠিক খেয়াল না রাখলে ইল্‌মলাভ সম্ভব নয়।

প্রকারান্তরে আমাদের দেশের যে পরিস্থিতি সেখানে অতিরিক্ত আরো কিছু ধৈর্যের দরকার। দ্বীনী শিক্ষার সদিচ্ছা হলে ঘর-বাড়ি, সংসার, পিতামাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির মায়াবন্ধন ছিন্ন করে কোন প্রতিষ্ঠানে যেতে হবে। যেখানে পিতৃস্নেহ বিরল। সমব্যথী ও সহানুভূতিশীল শুভানুধ্যায়ী নিতান্তই কম। আরামের আহার-বিহার নেই। আর্থিক অভাবের ফলে মাদ্রাসা কমিটি ছাত্রদেরকে কেবল এক তরকারী; তাতে কখনো কেবল ‘আমড়ার আঁটি বা পুঁয়ের ডাঁটি’ দিয়েই

ভাত দিতে রেজুলেশন পাশ করেন। তাই কাঁচা মরিচ বা পিঁয়াজ কামড়ে কিছু খেতে ও কিছু ফেলতে হয় অথবা নাশ্তার জন্য রেখে নিতে হয়! কোন মাসে খরচ বেশী হলে কর্তৃপক্ষের শাসানী শুনতে হয় বোর্ডিং সুপারকে। তাই তিনিও বেশ কড়া নজরে তেল-মসলা ও ডালের পরিমাণ যাতে আরো কম হয় সেই চেষ্টাই করেন। যার ফলে গরীব ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়ার অবস্থা যে শোচনীয় হয় তা বলাই বাহুল্য।

রুম অভাবে শয়নের এত কষ্ট হয় যে, কোন কোন স্থানে পাশ ফিরারও উপায় নেই। প্রচন্ড গরম ও শীত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাবে নিদ্রায় মধুরতা নেই।

স্বগৃহে থাকতে নিজেদের পরিবেশ অনুসারে ইসলামী (?) পোশাক পরিধান করে থাকলেও মাদ্রাসায় এসে হাঁটুর নিচে অবধি লম্বা ও ঢিলা পাঞ্জাবী হতেই হবে, বেশী চক্‌চকে হলে চলবে না। মাথায় সর্বদা টুপি রাখতেই হবে, চুল এত ছোট করতেই হবে যেন আঙ্গুল দ্বারা ধরা না যায় ইত্যাদি অতিরঞ্জিত বাধ্য-বাধকতার কানুনে বহু ছাত্রের মনে এই ইলমের প্রতি ‘নফ্‌রত’ সৃষ্টি হয়।

কোন কোন প্রতিষ্ঠানে সপ্তাহে অথবা মাসান্তে একবার মুষ্ঠি আদায় করতেই হবে। দ্বীনের জন্য হাত পাততে বা সাহায্য চাইতে কোন লজ্জা না থাকলেও (গর্ব থাকলেও) পরিবেশ গুণে তা ঘৃর্ণাহ ও লজ্জার কাজ। যার ফলে সংকোচ ও অপমান যেন গ্রাস করে ফেলে। ছাত্র গৃহিনীর কাছে ভর্ৎসনামূলক জবাব, দূর-দূরান্ত পথ পায়ে হেঁটে কায়িক পরিশ্রম, আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে এ মর্মে লজ্জাকর কথা এবং সাধারণ বহু লোকের নিকট থেকেও টিপ্পনী শুনে মনকে ধরে রাখা নেহাতই কঠিন হয়ে পড়ে।

পক্ষান্তরে এ শিক্ষা ব্যাপক করতে সমাজের পূর্ণ সহায়তার প্রয়োজন। কারণ, ধর্মহীন সরকারের নিমগাছ থেকে আঙ্গুরের আশা করা যায় না।

কিন্তু যাকাত না দিয়ে (নিজের নয় বরং) আল্লাহর প্রদত্ত ও আল্লাহর প্রাপ্য হক সমাজের মানুষের নিকট চাইতে গেলে তারা তা ভিক্ষা করা বলে। যা দেওয়া তাদের উপর ফরয এবং কেউ চাইতে না গেলে ঐ ভিক্ষাভান্ডের মাল তারা নিজেদের উদরসাৎ করে। যা ব্যয় করলে প্রকৃতপ্রস্তাবে নষ্ট হয়ে পায় না; বরং তার দুঃসময় ও দুর্দিনে উপকারার্থে জমা, গচ্ছিত ও বর্ধনশীল থাকে। সেই মাল আদায় করতে গেলে দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রতি ভ্রূকুটি হেনে কত গঞ্জনা, ভর্ৎসনা ও তিরস্কার শুনিয়ে থাকে। (যেমন, ভিক্ষাবৃত্তিতে সমাজের কি উপকার? মাদ্রাসায় ভিক্ষা পেশা শিক্ষা দেওয়া হয়, এসব পেট চালানোর বুদ্ধি, চাষ করে গিয়েছিল তাই দিতে হবে! ইত্যাদি।) অথচ মুসলিম হিসেবে মুসলিমের উচিত হল, যাকাৎ, ওশর, ফেৎরা ইত্যাদি দ্বারা নয় বরং নিজস্ব খাস অর্থ দ্বারা ঐসব প্রতিষ্ঠান চালানো।

কিন্তু আলহামদু লিল্লাহ, এসব কথা তারাই বলে থাকে যারা আল্লাহ ও পরকালে এবং দ্বীনের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও জ্ঞান রাখে না অথবা দ্বীনী শিক্ষা ও দরিদ্রের প্রতি কোন দরদ রাখে না। তাই অনেক ক্ষেত্রে তা মাতালের গালি বা পাগলের প্রলাপ মনে করে উপেক্ষা করে চলতে মাদ্রাসাকর্মীদের ধৈর্য হয়। অথচ প্রকৃতপক্ষে ভিক্ষাবৃত্তির পথ ওরাই প্রদর্শন করেছে। কারণ, ওরা যদি দ্বীনের কর্তব্য মনে করে ‘ফান্ড বা চাঁদার’ নামে অর্থ সাহায্য দিয়ে ঐ সব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার ব্যবস্থা করত তাহলে আর সেই শিক্ষাকে ‘ভিখিরি বিদ্যা’ বলে নাক সিঁটকে ঘৃণা করত না; যাকে ঘৃণা করলে এবং যা থেকে বিমুখ হলে ‘কাফের’ হতে হয়। এ তো চরম অন্যায় বিচার ও দৃষ্টিভঙ্গি যে, পার্টি বা অন্যান্য পার্থিব প্রতিষ্ঠান অথবা গান-বাজনা (!) প্রভৃতির আসর পরিচালনা করতে যে অর্থ সংগ্রহ করা হয় তা হল ‘চাঁদা’ দেওয়া ও তোলা। আর দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে অর্থ সংগ্রহ করার নাম হল ‘ভিক্ষা’ করা ও

দেওয়া! এমন বিচারে যে ঐ শ্রেণীর নিকৃষ্ট মানুষের দ্বীনের প্রতি চরম অনীহা ও বিদ্বেষ রয়েছে তা হয়তো তারা নিজেরাই অনুধাবন করে না!

অন্যদিকে এ এমন শিক্ষা যাতে পার্থিব বিলাস-ব্যসনে কোন লাভ নেই, ধর্মহীন দেশে কোন চাকুরী নেই। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পেলেও তেমন উল্লেখযোগ্য বেতন ও পারিশ্রমিক নেই। (অবশ্য এসব উদ্দেশ্যে দ্বীনী শিক্ষা বৈধ নয়।) তাতেও আদায় ঠিক মত না করতে পারলে চাকুরীর স্থায়ীত্ব ও নিশ্চয়তা নেই। যার ফলে এঁরা এক প্রকার সমাজের বোঝা (?)! কেউ তো নিরুপায় হয়ে নিজের জন্য যাচ্ঞাকে অভ্যাস বানিয়ে নেন। যার ফলে সমাজে আরো ঘৃণার্হ হয় এই শিক্ষা। এই সব অবস্থা দেখে আর সহজে কেউ মাদ্রাসায় ছেলে পাঠায় না। ছেলের মনে দ্বীনী স্পৃহা জন্ম নিলেও অভিভাবক বাধা প্রদান করে। যাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার অবস্থা এই যে, একান্ত গত্যন্তরহীন গরীব, অধম ও অক্ষম ছেলে ছাড়া অন্য ছেলেরা খুব কম সংখ্যকই দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্বীন ও চরিত্র শিক্ষা করতে যায়।

বহু প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষার ফলে অথবা (জায়গিরী ব্যবস্থার দরুন) ঘরোয়া পরিবেশের সহিত অধিক মিলামিশার কারণে কিশোর-কিশোরী বা তরুণ-তরুণীর অবৈধ সম্পর্ক অলক্ষ্যে গড়ে উঠে। যাতে অনেকে ফেঁসে গিয়ে শিক্ষা থেকে হাত ধুয়ে ফেলে।

এত সবকিছুকে উল্লঙ্ঘন করে চলতে হবে। ঐসব সমস্যার সমাধান বের করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নততর করার লক্ষ্যে সমাজের সহযোগিতা না পেলেও তাতে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। নচেৎ এ সবে ধৈর্যহীনতা ইলমের পথে বাধা হয়ে তালেব তথা সমাজকে জাহেল করেই রেখে দেবে।

আল্লাহ যেন সমাজে সেই সংস্কার দান করেন; যাতে দ্বীনী শিক্ষার পরিপূর্ণ অভ্যুদয় ঘটে এবং এমন উলামা তৈরী হন; যাঁরা তাঁর পথে

ধৈর্যশীলতার সহিত দ্বীন ও সমাজের নিঃস্বার্থ সেবা করতে পারেন। আল্লাহুম্মা আমীন।

ইল্‌ম তলবের পথে উলামাগণের উল্লেখযোগ্য সাধনা ও কষ্ট-স্বীকার

❖ হযরত যাবের (রাঃ) মাত্র একটি হাদীস শিক্ষা করার জন্য এক মাসের পথ শাম সফর করেছিলেন।

❖ হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ) মাত্র একটি হাদীস শ্রবণ করার জন্য মদীনা থেকে মিসর সফর করেছিলেন। (আল ইলমু যরুরাতুন শারইয়াহ ১৯পৃঃ)

❖ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ১৭০০ উস্তাযের নিকট থেকে ইল্‌ম গ্রহণ করেছিলেন। যখন তিনি ইল্‌ম তলবের জন্য ঘর ছেড়ে বের হয়ে যান তখন তাঁর বয়স ছিল ২০ বছর। আর যখন ফিরে আসেন তখন তাঁর বয়স হয় ৬৫ বছর।

❖ বাকী' বিন মাখলাদ ইমাম আহমদের নিকট ইল্‌ম শিক্ষার জন্য দুবছর ধরে পায়ে হেঁটে শামে যখন পৌঁছলেন তখন ইমাম কারাগারে বন্দী। খবর শুনে তিনি কেঁদে ফেললেন; বললেন, 'আমি যাঁর জন্য দুটি বছর ধরে হেঁটে সফর করে এলাম তিনি এখন জেলে!' পরে তিনি কোন প্রকারে ইমামের সহিত জেলে সাক্ষাৎ করলেন। উভয়ে স্থির করলেন যে, ভিখারীর বেশে বাকী' জেলখানায় আসবেন এবং আস্তিনের ভিতর কাগজ-কলম-কালি লুকিয়ে নিয়ে এসে হাদীস লিখবেন। সুতরাং ইমাম সাহেবের মুক্তি পর্যন্ত বাকী' ঐভাবেই জেলে গিয়ে ইল্‌ম শিখেছিলেন।

❖ আবু হাতেম রাযী বলেন, প্রথম সফরে আমি সাত বছর কাটাই। ১০০০ ফরসখ (প্রায় ৩০০০ মাইল) এরও বেশী পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করি। অতঃপর বাহরাইন থেকে মিসর পায়ে হেঁটেই যাত্রা করি। সেখান থেকে রাম্‌লা অতঃপর তুরসূস যাই। আমার বয়স তখন ২০ বছর। (তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায ২/২৩৩)

❖ ইবনুল জওযী বলেন, ‘আমি ছোটবেলায় কিছু রুটি সঙ্গে নিয়ে ইল্‌ম তলবের জন্য বের হয়ে যেতাম। পরে রুটি শুকিয়ে যেত। শেষে এক লোকমা রুটি খেতাম ও তার সঙ্গে পানি পান করতাম। ইল্‌ম তলবের যে উদ্যম ছিল কেবল তারই ফলশ্রুতিতে এত কষ্ট বরণ করতে আমি মিষ্ট স্বাদ পেয়েছি।’ *(সাইদুল খাতের ২৩৫পৃঃ)*

❖ ইবনে আবী হাতেম বলেন, ‘ইল্‌মের পথে আমরা মিসরে সাত মাস অবস্থান করি এর মধ্যে একটা দিনও রান্না করা তরকারী খায়নি। দিনের বেলায় উস্তাযদের নিকট কাটাতাম। আর রাতের বেলায় নোট করতাম ও সংশোধন করতাম। একদিন আমার সহপাঠী সহ এক উস্তাযের নিকট এলাম। শুনলাম তিনি অসুস্থ। ফেরার পথে একটা মাছ দেখে আমাদের পছন্দ হল। (ভাবলাম, বাসায় ফিরে পাকিয়ে খাব।) কিন্তু যখন বাসায় ফিরলাম তখন অন্য এক উস্তাযের নিকট হাযীর হওয়ার সময় হয়ে গেল। মাছ থাকল পড়ে। পাকানো আর হল না। পরিশেষে যখন পঁচে যাওয়ার কাছাকাছি হল তখন তা কাঁচাই ভক্ষণ করলাম! আর সত্য কথা যে, শরীরকে আরাম দিয়ে ইল্‌ম লাভ হয় না।’ *(তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায ৩/৮৩০)*

❖ ইবনে খার্রাশ বলেন, ‘আমি ইল্‌ম ও হাদীস তলবের পথে ৫ বার (পিপাসায়) নিজের পেশাব নিজেই খেয়েছি!’ *(উলুউবুল হিম্মাহ ১৬৩পৃঃ)*

❖ আবু আব্দুল্লাহ হাকেম বলেন, ‘একদিন আবুল আব্বাসের

মসজিদে গেলাম। তিনি আসরের আযান দেওয়ার জন্য মিনারে খাড়া হলেন। কিন্তু আযানের পরিবর্তে উচ্চ শব্দে ‘আখবারানার রাবীউব্‌নু সুলাইমান, আখবারানাশ শাফেয়ী---’ বলতে লাগলেন! এ শুনে সকলেই হেঁসে উঠল। পরে তিনি আযান দিলেন। *(আল আনসাব ১/২৯৭, আস্‌সিয়ার ১৫/৪৫৮)*

❖ একদা আবূ বাক্‌র ইবনুল বাগেন্দী নামায পড়তে দাঁড়ালেন। তকবীর দিয়ে পড়তে শুরু করলেন, ‘হাদ্দাসানা মুহাম্মাদুবনু সুলাইমান----।’ লুকমাহ দেওয়া হলে তবেই তিনি সূরা ফাতিহা ধরলেন! অনুরূপ ঘুমের ঘোরেও কখনো কখনো তিনি হাদীস মুখস্থ পড়তেন। *(উলুউবুল হিম্মাহ ১৮৫ পৃঃ)*

❖ আস্‌সাহেব খুব কিতাব ভালোবাসতেন। কিতাব কিনতে কিনতে এমন অবস্থা হয়েছিল যে, তা কোথাও বহন করার দরকার হলে ৪০০ উঁট লাগত। *(আস্‌সিয়ার ১৬/৫১৩)*

❖ শায়খ আহমদ হাজ্জার কিতাব ভালোবাসতেন খুব। একদিন এক জায়গায় একটি কিতাব বিক্রি হতে দেখলেন। কিন্তু তাঁর নিকট দিরহাম ছিল না। তাঁর দেহে যে লেবাস ছিল তার কিছু বিক্রি করে সাথে সাথে সে কিতাবটি খরীদ করেছিলেন! *(উলুউবুল হিম্মাহ ১৯১পৃঃ)*

❖ ইল্‌ম তলবের পথে ইমাম মালেকের অর্থের দরকার হলে তিনি নিজের ঘরের চালের কাঠ বিক্রয় করেছিলেন। *(তারতীবুল মাদারিক ১/১৩০)*

❖ খতীব বাগদাদী যখন শামদেশ সফর করেন তখন তিনি তিন মাসের ভিতরে টীকা লেখা সহ ১০০ জিল্দ্‌ কিতাব পড়েন।

❖ আল্লামা আলবানী নিজের দোকান বন্ধ করে যাহেরিয়া পাঠাগারে ১২ ঘন্টা কিতাব মুতালাআহ করতেন। *(ইতহাফুল ইখওয়ান বিআহাম্মিয়াতিল ক্বিরাআহ ১২-১৪পৃঃ)*

❖ জাহেযের হাতে কোন কিতাব পড়লে তিনি তা না পড়ে ছাড়তেন না। কাতেবদের দোকান শুধু তাদের লিখিত কিতাব মুতালাআর জন্য ভাড়া নিতেন। *(কিতাবুল হাইওয়ান, মুকাদ্দামাহ ৫পৃঃ)*

তাঁর অতিরিক্ত ইল্‌ম ও আদব আসক্তির ফলে তিনি তিন-তিনবার নিজের উপনাম ভুলে গিয়েছিলেন! *(তারীখুল বাগ্‌দাদ ১২/২১৪, মু'জামুল উদাবা' ৬/৫৬)*

❖ আবূ অলীদ বাজী পাহারাদারদের মশালের ধারে বসে বই মুতালাআহ করতেন! *(উলুউবুল হিম্মাহ ৩৮-৭পৃঃ)*

❖ ইমাম বুখারী রাতে শয়নাবস্থায় কোন জরুরী কথা মনে উদ্রেক হলে উঠে বাতি জ্বালিয়ে তা নোট করে নিতেন। পুনরায় বাতি নিভিয়ে শুয়ে আবার কিছু মনে পড়লে আবার উঠতেন ও বাতি জ্বালিয়ে লিখে নিতেন। এইরূপ কোন কোন রাতে তিনি ২০বার পর্যন্ত উঠতেন ও শয়ন করতেন! *(আল বিদায়াহ অন্নিহায়াহ ১১/ ১৫)*

❖ আবু যুরআহ বলতেন, 'লোকেরা যেমন 'কুল হুঅল্লাহু আহাদ' মুখস্থ রেখেছে তেমনি আমি দুলাখ হাদীস মুখস্থ রেখেছি। এছাড়া আমার মোট হাদীস স্মৃতিস্থ আছে তিন লাখ!' *(সিফাতুস সাফওয়াহ ৪/ ৮৮)*

❖ ইমাম আহমদ উস্তায বাক্‌র বিন আইয়্যাশের দর্সে উপস্থিত হওয়ার জন্য ফজরের পূর্বে বাড়ি হতে বের হতেন। এ দেখে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁর মা তাঁর জামা কাপড় লুকিয়ে দিতেন এবং বলতেন, 'বেটা আযান হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।' *(ইতহাফুল ইখওয়ান)*

❖ আবূ মুহাম্মাদ ইবনুল আকফানী ইল্‌ম ও উলামার পথে ১লাখ দীনার ব্যয় করেছিলেন। *(তারীখুল বাগদাদ ১০/১৪১, আল্‌আনসাব ১/৩৩৯, আস্‌সিয়ার ১৭/১৫২)*

❖ একদা আবূ নাস্র সাজ্যীর নিকট এক মহিলা ১ হাজার দীনার পেশ করে বলল, 'আপনি এ অর্থ যেখানে খুশী সেখানে ব্যয় করুন।' তিনি অর্থের থলে নিয়ে বললেন, 'তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি?' মহিলাটি বলল, 'আমার ইচ্ছা যে, আপনি আমার স্বামী হন। অবশ্য আমার স্বামীর প্রয়োজন আছে এমন নয়। (কারণ, আমি তো বৃদ্ধা মানুষ।) তবুও আমি আপনার খিদ্মত করব।' তিনি তার আবেদন না-মঞ্জুর করে বললেন, 'আমি সাজিস্তান থেকে ইল্ম তলবের নিয়ত করে বের হয়েছি। আর ইল্মের সওয়াবের উপর অন্য কিছুকে প্রাধান্য দেব না।' *(তাযকিরাতুল হুফ্ফায ৩/ ১১৯, আস্সিয়ার ১৭/৬৫৫)*

❖ হুমাইদীর জ্ঞানচর্চার আগ্রহ এত বেশী ছিল যে, তিনি গ্রীষ্মকালে রাত্রিবেলায় যখন ইল্ম নোট করতেন তখন গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য বড় পাত্রে পানি রেখে তার মাঝে বসে লিখতেন! *(আস্সিয়ার ১৯/ ১২২)*

❖ জা'ফর ইবনুল মারাগী বলেন, একদা আমি তস্তরের কবরস্থানে প্রবেশ করে উচ্চ শব্দ শুনতে পেলাম, 'অলআ'মাশ, আন আবী সালেহ, আন আবী হুরাইরাহ। অল আ'মাশ, আন আবী সালেহ, আন আবী হুরাইরাহ----।' অনেক্ষণ ধরে এ শব্দ শোনার পর খোঁজ নিয়ে দেখলাম তো ইবনে যুহাইর এক স্থানে বসে হাদীস মুখস্থ করছেন।'

অনেকে তাহাজ্জুদ পড়তে উঠে কিছু নামায পড়ার পর হাদীস মুখস্থ করতেন।

উলামাদের নিকট সময়ের মূল্য ছিল অনেক। কোন সময় ইল্মী চর্চা ছাড়া ফালতু যাক্ এ তাঁরা চাইতেন না। আমার এক আদর্শ উস্তাযকে বলতে শুনেছি যে, পড়ার জীবনে তাঁরা

পায়খানা করার সময়টুকুও নষ্ট হতে দেননি! মীযানের ‘ফাআলা-ফাআলা-ফাআল্‌’ প্রভৃতি গর্দান (সূত্র) সেই সময় পুনরাবৃত্তি করতেন।

কারণ, যে সময় চলে যায় তা আর ফিরে আসে না। সুতরাং সুযোগের সদ্ব্যবহার করাই হল জ্ঞানীর কাজ।

সময় হল তরবারীর মত। মানুষ সতর্ক না হলে তার সমুদয় কল্যাণ কেটে ধ্বংস করে। ‘সময় চলিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়’ কেউ তাকে ধরে রাখতে পারে না। সবচাইতে সত্বর ও সহজে যে জিনিস হাতছাড়া হয় তা হল মানুষের সময়। তাই তালেবে ইল্‌মের নিকট সময় অধিক ও বিশেষরূপে যত্ন পাওয়ার যোগ্য।

والوقت أعظم ما عنيت بحفظه + وأراه أسهل ما عليك يضيع

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

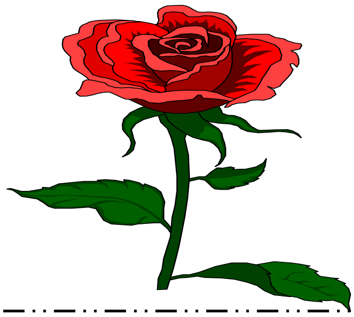সমাপ্তি